সাকারোপাসনা
ও
ব্রহ্মজ্ঞান।

শ্রীতারকগোপাল ঘোষ বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রণীত।

[illegible] প্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

[illegible], ৩৬ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
সমর্থকোষ প্রেস,
সন্ন এণ্ড সনস দ্বারা মুদ্রিত
১২৯৬

মূল্য ।৵ চারি আনা মাত্র।

উপক্রমণিকা।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি সর্ব্বদাই আমাদিগকে পর-
মেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হয়। যে কোন অভীষ্ট-
সাধনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার দিকে আমাদিগকে তাকাইয়া
থাকিতে হয়। মানুষ সকলবিষয়েই তাঁহার ইচ্ছার অধীন।
এই জন্যই সকল দেশে, সকল সময়ে, সকলেই ঈশ্বরের কথা
বলে। আমরা যে কেবল তাহার অধীন তাহাই নহে, পরন্তু
তাঁহাকে না পাইলে আমাদের চলে না। কিন্তু কি উপায়ে
তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে ইহাই একটী গভীর সমস্যা।
নানা দেশে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া লোকে এই সাধন
করিতেছে। এই সাধনকেই সাধারণতঃ উপাসনা বলে। আমাদের
দেশে সাকার উপাসনাই বহুলরূপে চলিত আছে। সেই মহান
উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এই পদ্ধতি কতদূর উপযোগী, তাহাই
আলোচনা করা এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা কোন
সামান্য কার্য্য সাধন করিতে গেলেও তাহার উপায় সম্বন্ধে
সম্যক্ চিন্তা করিয়া থাকি। চিন্তা না করিয়া এবং আগে
মনকে সন্তুষ্ট না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না। সুতরাং
এই মানব জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম লক্ষ্য সাধনের জন্য
আমাদিগের আরও বিশেষরূপে চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে আমাদের আলো-
চনার প্রণালী সম্বন্ধে দুটী একটী কথা বলা প্রয়োজন। আমরা
শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিব। আমাদের
দেশ অতি প্রাচীন। অনেক জ্ঞানী মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া

এই ভারত-ভূমিকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আপন আপন জ্ঞান ও চিন্তার ফল-স্বরূপ শাস্ত্রসকল আমাদিগের জন্য সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মহীয়সী চিন্তার সাহায্য পাইলে অনেক সুবিধা হইবে। পুনশ্চ, প্রাচীন শাস্ত্রসকলের প্রতি সকলেরই অচলা শ্রদ্ধা আছে। সেজন্যও শাস্ত্রীয় প্রমাণ একান্ত প্রয়োজন। আবার যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্র অনুসন্ধান করে, তাহাকে শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতসকলের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া প্রকৃত সত্য-লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। যুক্তিহীন বাক্য বা কার্য্য মনুষ্যের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত আছে,

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

বৃহস্পতি।

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিচার করা উচিত নহে। যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া নানা প্রকার বিরুদ্ধ মত অতি সহজেই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন। একমাত্র শাস্ত্রের নাম করিয়াই নানা বিরুদ্ধ মত প্রচলিত হইতেছে। সুতরাং কেবল শাস্ত্র দেখিতে গেলে আমরা সেই সকল বিরুদ্ধ মতের কোনটীকেই মিথ্যা বলিতে পারি না, অথচ সকল মত গ্রহণ করাও সম্ভব নহে। সুতরাং যুক্তিদ্বারা যাহাকে সত্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই গ্রহণীয়। যাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও আপন আপন যুক্তিতে যাহা ভাল বোধ করিয়াছেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন, যথা,—

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

যোগবাশিষ্ঠ।

অযৌক্তিক কথা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিলেও তাহা পরিত্যাজ্য, এবং শিশুও যদি যুক্তিযুক্ত কথা বলে, তাহাও গ্রহণীয়। মানুষ যতই শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া চীৎকার করুক, কাযের বেলা সকলেই আপন যুক্তির অনুগমন করে। সুতরাং কুটীল তর্ক পরিত্যাগ করিয়া, সরল জ্ঞান ও যুক্তি অবলম্বন করাই আমাদের উচিত। কুটীল তর্ক এবং বাহাদুরী দেখান, উভয়ই পরিত্যজ্য। পাঠক-বর্গের নিকট আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা এই কথাগুলি স্মরণ রাখেন।

আরও একটী কথা। শাস্ত্র সম্বন্ধেও লোকের বিস্তর মত-ভেদ আছে। বিশেষতঃ অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রবিষয়ে অন-ভিজ্ঞ। সুতরাং সে বিষয়েও অনেক গোলযোগের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমরা যে উপায় অবলম্বন করিব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র, সকল শাস্ত্রেই পরমার্থ-তত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং কাহাকেও একেবারে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করি না। কিন্তু যে বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা থাকে, সে বিষয়ে তন্ত্র অপেক্ষা পুরাণ, পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতি, এবং স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতি-রই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতির মধ্যেও অনেক স্থলে আপাততঃ বিরুদ্ধ মতসকল দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। সেস্থলে বেদান্তদর্শনের মীমাংসাই গ্রহণীয়। বেদের শিরোভূষণস্বরূপ উপনিষদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য।

সেই উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদের সমন্বয় করাই বেদান্তসূত্রের উদ্দেশ্য। প্রসিদ্ধ লোকের ভাষ্যসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা উচিত। শ্রুতি, বেদান্তসূত্র ও গীতাশাস্ত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। শ্রীধরস্বামী, গীতা ও ভাগবতের টীকা করিয়াছেন, এবং তাঁহার টীকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত। যাঁহাদের কোন ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক টীকা দেখিলেই সন্দেহ দূর হইবে।

পাঠকগণের প্রতি আর একটী নিবেদন এই যে, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া যেন পরিত্যাগ না করেন। সমগ্র পুস্তক পাঠ করিয়া যদি অসার বলিয়া মনে হয়, শাস্ত্র ও যুক্তি-সম্মত প্রতিবাদ করিলে উপকৃত হইব।

সাকারোপাসনা

ও

ব্রহ্মজ্ঞান।

আমাদের দেশ যেমন প্রাচীন, ভগবানের কৃপায় ধর্ম্মসম্বন্ধেও এদেশে তেমনই বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং একথা প্রায় অধিকাংশ লোকেই বোঝেন যে, একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময় পরমেশ্বরহইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন, ইহা সকলেই জানেন, এবং সকলেই বিশ্বাস করেন। তাঁহার কোন প্রকার ভৌতিক আকার নাই, ইহাও সকলেই জানেন। আমরা সর্ব্বদাই সকল কার্য্যে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকি, সুতরাং ইহাও বিশ্বাস করি যে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী। যদিও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক ইহা বিশ্বাস করেন, তথাচ সময় সময় কেহ কেহ একথার প্রতিবাদও করেন। কিন্তু সরল বুদ্ধি সে প্রতিবাদে সায় দিতে পারে না। ঈশ্বর সাকার হইলে, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্ কখনও হইতে পারেন না। আকার যতই বড় হউক, সীমা থাকিবেই। আরও দেখা যায়, আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার শক্তি এবং ইচ্ছা অনুভব করিতেছি। কেননা সকলেই জানেন, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে

আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। আমরা প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াই বলি, "এক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছা"। যাহা হউক, আমরা তাঁহার ইচ্ছা এবং শক্তি অনুভব করি, কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। পুনশ্চ, তিনি যখন সমস্ত জড়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন স্বয়ং জড়দেহধারী হইলে, তাঁহার দেহেরও সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই হইলেন, কেননা তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই। জড়ই সৃষ্ট পদার্থ। সেই জড়দেহ অনাদি হইলে তাঁহাকে জড়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় না। এসকল কথা সহজজ্ঞানে প্রতীত হয় এবং আস্তিকমাত্রেই ইহাতে বিশ্বাস করেন। আমাদের এই গ্রন্থখানিও আস্তিকদের জন্য, নাস্তিকের জন্য নহে। শাস্ত্রেও বলেন,

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র-আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ॥ শ্রুতি। তথাহি,—

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ॥

এ জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয়শিষ্য! কেবল এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন, মহান্ আত্মা, তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়।

তিনি বিশ্ব-সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃজন করিলেন।

অনেক শাস্ত্রে সাকার উপাসনার বিধি আছে, সত্য। কিন্তু সেই সকল শাস্ত্রই তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া প্রমাণ দিতেছেন। তন্ত্র, পুরাণ, বেদ সকলেরই এক কথা। যথা—

অস্তি দেবি পবব্রহ্মস্বরূপো নিষ্কলঃপরঃ।
স্বয়ং জ্যোতির্নাদ্যন্তোনির্ব্বিকারঃ পরাৎপরঃ।
নির্গুণসচ্চিদানন্দস্তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ॥
কুলার্ণব, ৫ম খণ্ড, প্রথম উল্লাস, ৭।৮ শ্লোক।

দেবি, পরব্রহ্মেব স্বরূপ নিরাকার এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকাব, পবাৎপব নির্গুণ ও সচ্চিদানন্দ। জীবসংজ্ঞক সকলই তাঁহার অংশমাত্র।

স একএব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ-লক্ষণঃ॥
নির্ব্বিকাবোনিরাধারোনির্ব্বিশেষোনিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥
মহানির্ব্বাণ। ২য় উল্লাস, ৩৪।৩৫ শ্লোক।

তিনি এক, সৎ-স্বরূপ, সত্য, অদ্বিতীয, পবাৎপর, স্বপ্রকাশ, সদাপূর্ণ, সচ্চিদানন্দলক্ষণ, নির্ব্বিকার, নিবাধাব, নির্ব্বিশেষ নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বদর্শী বিভু।

রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ।
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং॥
বিষ্ণুপুরাণ। প্রথমাংশ,২য় অধ্যায়।

রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ-রহিত, নাশ ও পরিবর্ত্তন-শূন্য, দুঃখ এবং জন্মবিহীন পরমাত্মা হয়েন, কেবল আছেন, এই মাত্র বলিয়া তাঁহাকে কহা যায়।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপানিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ম মুণ্ডক, ষষ্ঠ শ্লোক॥

এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্॥

অর্থঃ—যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্মরহিত, রূপরহিত, চক্ষুশ্রোত্ররহিত, সেই হস্তপদ-শূন্য, জন্মমৃত্যুবর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতিসূক্ষ্মস্বভাব, হ্রাস-রহিত সর্ব্বভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন।

হে গার্গি, ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন, তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অবর্ণ, অবাক্, তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিকপ্রাণবিহীন, কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
তলবকার উপনিষৎ, ৪,৫ শ্লোক।

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহাদ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যেকিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন—লোকে মনেরদ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ ॥

ইত্যাদি। কঠোপনিষদ্, ৩য় বল্লী, ১৫ শ্লোক।

তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও ক্ষয়-রহিত নিত্য ইত্যাদি।

তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

ব্রহ্ম নাম রূপ হইতে ভিন্ন।

আহহি তন্মাত্রং। বেদান্তসূত্র। ৩য় অ, ২পা, ১৬ সূত্র।

বেদে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র কহিয়াছেন।

অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ।

বেদান্তসূত্র, ৩য় অ, ২ পাদ, ১৪ শ্লোক।

ব্রহ্ম কোন প্রকার রূপবিশিষ্ট নহেন, কেননা নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতিরই প্রাধান্য দেখা যায়।

এই প্রকার সহস্র সহস্র শ্লোক আছে। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্ কেবল ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাহুল্যরূপে আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। অধিকাংশ পাঠকই ঈশ্বরকে নিরাকার স্বীকার করেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলেন না এবং বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগের বাস্তবিক ঈশ্বরসম্বন্ধে আদৌ জ্ঞান হয় নাই। আর এটুকু না জানিলে ঈশ্বরোপাসনা হইতেই পারে না। ক্ষুধার সময় আহার করিলে পরিতোষ হয়, ইহা আমরা সকলেই চক্ষুর সাহায্য বিনাই অনুভব করি, উপলব্ধি করি। সেইরূপ ঈশ্বর আছেন, ইহাও

উপলব্ধি করি। আছেন বুঝিতেছি, কিন্তু রূপ দেখিতে পাই না, কাযেই বলি নিরাকার। সর্ব্বত্রই অনুভব করি, কাযেই বলি সর্ব্বব্যাপী। এই জ্ঞান না থাকিলে, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার উপাসনাই হইতে পারে না। শাস্ত্রসকল একবাক্যে ঈশ্বরকে নিরাকার অঙ্গীকার করিতেছেন। তাঁহারা বহুরূপে সাকার উপাসনার বিধিও দিয়াছেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রয়োজন নাই। আপামর সাধারণ সকলেই ইহা জানেন ও বিশ্বাস করেন। কিন্তু আবার দেখা যায়, সেই সকল শাস্ত্রই সাকার উপাসনাকে যথেষ্ট নিন্দাও করিয়াছেন। বারবার বলিতেছেন ইহা ব্রহ্মোপাসনা নহে। ব্রহ্মোপাসনার ফলও ইহাতে হয় না।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

অর্থাৎ যাহারা মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু এবং কাষ্ঠ ইত্যাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর-জ্ঞান করে, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ তপস্যা-দ্বারা কেবল ক্লেশই পায়, কিন্তু পরম শান্তি লাভ করিতে পারে না।

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
ভাগবত, ৩য় স্ক, ২৯ অ, ১৮ শ্লোক।

আমি নিখিল ভূতে সর্ব্বব্যাপী আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর। যে ব্যক্তি এবম্ভূত আমাকে ত্যাগ করিয়া, মূঢ়তা-প্রযুক্ত প্রতিমাদির পূজা করে, সে ভস্মে হোম করে।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥

ঐ, ১৯ শ্লোক।

আমি সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত, এমত আমাকে না জানিয়া মনুষ্যসকল প্রতিমাদিতে পূজার বিড়ম্বনা করিতেছে।

যস্যাত্মবুদ্ধি কুনপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ।

অর্থাৎ এই ত্রিধাতুক শরীরে যে ব্যক্তি আত্মবুদ্ধি করে, এবং কলত্রাদিকে আপনার জ্ঞান করে, মৃণ্ময় মূর্ত্ত্যাদি পূজাকে ঈশ্বরো-পাসনা মনে করে, এবং জলে তীর্থ বোধ করে কিন্তু কোন অভিজ্ঞ জনে করে না, সে গরুর মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় মূর্খ।

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥

আহ্নিকতত্ত্বধৃত শাতাতপবচন।

সাধারণ মনুষ্যেরা জলে ঈশ্বর বোধ করে, বুদ্ধিমানেরা গ্রহাদিতে, মূর্খেরা কাষ্ঠলোষ্ট্রে এবং জ্ঞানীরা আত্মাতে ঈশ্বর বোধ করেন।

যোবা এতদক্ষরমবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপ-স্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি ॥ শ্রুতি।

হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম, যাগ, তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

এইক্ষণ সহজেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি শাস্ত্রকারেরা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিলেন এবং সাকার উপাসনার নিন্দা করিলেন, তবে তাঁহারা সাকার উপাসনার বিধি প্রদান করিলেন কেন?

ইহার উত্তর এই যে, সকল লোকে জ্ঞানী হয় না এবং সহজে সাধারণ লোকে ঈশ্বরের দিকে যাইতে চায় না। সমাজে যদি একটা বাঁধাবাঁধি না থাকে, এবং মূর্খ আমোদ-প্রিয় লোকগুলিকে কোন প্রকারে বশীভূত না রাখা যায়, তাহাতে বিস্তর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং কোন প্রকারে এই সকল কৃত্রিম, মনস্তুষ্টিকর এবং আমোদ-জনক ক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথহইতে আকর্ষণ করাই শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগকে একেবারে আমোদ প্রমোদ হইতে বঞ্চিত করিতে গেলে, কেহই প্রস্তুত হইবে না, এই মনে করিয়াই শাস্ত্রকারগণ এই সকল উপায় করিয়াছেন। একেবারে ধর্ম্ম নাই মনে করা অপেক্ষা এ সকল অনুষ্ঠান লইয়া থাকাও ভাল। তাঁহারাও বার বার বলিতেছেন এ সকল মূর্খদের নিমিত্ত। যথা—

এবমুনাহুসারেন রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতাণি হিতার্থায় ভক্তানাং অল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত এইরূপে গুণানুসারে বিবিধ প্রকার রূপ কল্পিত হইয়াছে।

এই সকল অর্চ্চনার বিধি যে লোক-রঞ্জনের নিমিত্তই হই যাছে তাহারও প্রমাণ আছে, যথা,—

তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোক-রঞ্জন-কারণং।
মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥
কুলার্ণব তন্ত্র, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস, ৮৫ শ্লোক।

অর্থাৎ এই সকল কর্ম্ম কেবল লোক-রঞ্জনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, হে কুলেশ্বরি, তত্ত্বজ্ঞানকেই মোক্ষের কারণ বলিয়া জানিবে। পুনশ্চ,

মূঢানাং ভোগদৃষ্টীনামাত্মানাত্মাবিবেকিনাং।
রুচয়ে চাধিকারায় বিদধাতি ফলং শ্রুতিঃ॥

যাহারা মূঢ় এবং কেবল সংসারের ভোগসুখকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে এবং আত্মানাত্ম-জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ এবং অধিকারের (সাধ্যায়ত্ত করিবার) জন্য, শ্রুতি নানা প্রকার অনুষ্ঠানের বিধান করিয়া, তাহা হইতে ফল-লাভ হইবে বলিতেছেন। বস্তুত অজ্ঞান লোকদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্য, তাহাদিগকে বিষম উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই তাঁহারা এই সকল বিধি করিয়াছেন। যে যেমন লোক, তাহার জন্য সেইরূপ বিধান।

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ॥

অধিকারিভেদে নানা প্রকার শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রেও ঠিক এইরূপ বলিতেছেন।

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যাযস্ত্বং তথাহি দর্শযতি ॥

৩য় অ, ৩য় পা, ৫৮ সূত্র।

অর্থাৎ যেমন অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সকল উপাসনার মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা শ্রেষ্ঠ, বেদ এইরূপ বলেন।

তবে নানা প্রকার উপাসনা কেন? পর সূত্রেই তাহার উত্তর দিয়েছেন।

নানা শব্দাদি ভেদাৎ।

ঐ, ঐ, ৫৯ সূত্র।

অর্থাৎ পৃথক পৃথক অধিকারীরা পৃথক পৃথক উপাসনা করে, যেহেতু শাস্ত্র ও আচার্য্য নানা প্রকার। চিরকাল এক প্রকার চলিতে হইবে না। আর, সকলেই যে এক প্রকার অনুষ্ঠান করিবে, তাহাও নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা যে ব্যক্তি না জানে, ঈশ্বর বলিলে যে কিছুই না বোঝে, সে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনাও করিতে পারে না। তথাহি—

তাবত্তপোব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকং।

বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥

কুলার্ণব, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস, ১১৬ শ্লোক।

যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, ততদিন তপ, ব্রত, তীর্থ, জপ, হোম অর্চ্চনা, বেদ, শাস্ত্র এবং আগমের প্রয়োজন।

অর্চ্চাদাবর্চ্চযেৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ॥

ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায, ২০ শ্লোক।

অর্থাৎ আমি পরমেশ্বর, সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছি, ইহা যাবৎ না বুঝিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদির পূজা করিবে। কিন্তু ইহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করিবে এবং যাঁহারা ঈশ্বরবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তি-দের নিকট গিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিবে।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম ॥ শ্রুতি।

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ
অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য় মুণ্ডক, ২ খণ্ড, ৫ম শ্লোক।

সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, ইনি অমৃত-ধাম ও মোক্ষ লাভের সেতু।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ
স বিদ্বান্ শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ
সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।

ঐ, প্রথম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ১২, ১৩ শ্লোক।

পরম ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থ শমদমাদিযুক্ত আচার্য্য-সন্নিধানে গমন করিবে। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য তাহাকে শমান্বিত দেখিয়া যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।

এই প্রকারে ঈশ্বরের জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন থাকিবেক না।

যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনং।
তত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনং।

কুলার্ণব, ৫ম খ, ১ম উ, ১০৪ শ্লোক।

যেমন অমৃতপানে তৃপ্ত হইলে অন্য আহারের প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ তত্বজ্ঞান লাভ করিলে এই সকল প্রতিমাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

বিদিতে তু পরে তত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে।
কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥

কুলার্ণব। ৯ ম উ।

বিকারবিহীন বর্ণাতীত ব্রহ্মতত্ব বিদিত হইলে মন্ত্রসকল তাহাদিগের প্রতিপাদ্য অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপে ঈশ্বরকে চিন্ময় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান হইলে তখন ধ্যান,চিন্তন,মনন ও কীর্ত্তনাদিদ্বারা তাহারই উপাসনা করিতে হইবে, এবং এই সকল নানা প্রকার ভোগসুখ-সম্বলিত স্বর্গ, এবং জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ শাস্ত্রের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিবে। কেননা এ সকল ত্যাগ না করিলে মন একাগ্র হইয়া ঈশ্বরে সমাহিত হইতে পারে না। তথাহি—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
গীতা, ২য় অধ্যায়, ৪২-৪৫ শ্লোক।

যে সকল মূঢ় ব্যক্তিরা বেদের ফলশ্রবণ বাক্যে আসক্ত হইয়া, ঐ সকল আপাতমধুর ও পরিণামে কুফলপ্রদ বাক্যকেই পরমার্থ-সাধক কহে, এবং উহার অতীত আর ঈশ্বর-তত্ত্ব নাই বলে, যাহাদের চিত্ত কামনাসক্ত, যাহারা দেবলোক স্বর্গকেই জীবাত্মার পরম পুরুষার্থ মনে করে, যাহারা ভোগৈশ্বর্য্যে লোভ প্রদর্শনকারী, এবং জন্ম, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল প্রদানকারী এবং বহুবিধ ক্রিয়াপরিপূর্ণ আপাতমনোরম বাক্য সকলকেই সার কথা বলিয়া প্রচার করে, তাহাদের চিত্ত ঐ সকল ভোগসুখে আসক্ত হওয়াতে ঈশ্বর বিষয়ে নিষ্ঠা এবং সমাধি প্রাপ্ত হয় না। হে অর্জ্জুন, বেদ সকল কেবল কামনার বিষয় প্রকাশ করে; তুমি কামনা ত্যাগ কর।

ফলতঃ সকল শাস্ত্রই তত্ত্বজ্ঞানকেই একমাত্র মুক্তির উপায় বলিতেছেন। যিনি মুক্তিপ্রার্থী, তিনি তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণ করিবেন। আর যাহারা তাহা চায় না, পরন্তু কেবল সংসারের অনিত্য সুখের জন্যই লালায়িত, তাহাদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্যই এই সকল লোক-বঞ্চক, চিত্তের আমোদ-জনক বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা জানিয়াও যাহারা শ্রেষ্ঠ পথ পরিত্যাগ করিয়া, মূঢজনোচিত পথে একান্ত অনুরক্ত হইয়া তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে, এবং লোক সকলকে এই সারাৎসার ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিমুখ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে আর কি বলিব? •কোথায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া

সম্ভব এই সকল কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে লালায়িত হইবে, এবং এই সকল নুচোচিত ক্রিয়া কলাপের ক্ষুদ্রত্ব লোকদিগকে বুঝাইয়া দিয়া মুক্তির একমাত্র সোপান-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য উৎসাহিত করিবে, না সর্ব্বদাই তাহার বীপরীত আচরণদ্বারা আপনার ও অন্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তাহারা অতি যত্নসহকারে সকলকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলেই বলে, "আমরা মূর্খ, সুতরাং আমাদের এই পথ শ্রেয়ঃ"। যে সকল ব্যক্তি নিজকে মূর্খ প্রতিপাদন করিবার জন্য কুটীল যুক্তি, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাসকল করিতে পারে, তাহারা মূর্খ না হইলেও আত্মপ্রতারিত অন্ধ বটে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদিগকে জ্ঞানী না বলিলে এবং মূর্খ বলিলে, কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না, এবং নিজেরা মূর্খ হইয়াও জগতের সকল তত্ত্ব অহঙ্কারপূর্ব্বক আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিতে চায় এবং সকলকে মূর্খ বলিয়া নিন্দা করে। এটী বাস্তবিক মূর্খতারই লক্ষণ।। যাহা হউক, যদি লোকসকল সত্য সত্যই এতদূর মূর্খ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে এই মূর্খতা দূর করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে,—

> ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিন এবচ।
> যথেষ্টাচরণস্যাহুঃ মরণান্তমশৌচবম্।।

অর্থাৎ, সদনুষ্ঠানহীন, মূর্খ, মহারোগী এবং যথেচ্ছাচারীরা মরণ পর্য্যন্ত অশুচি থাকে।

স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেও প্রতীয়মান হইতে পারে যে, যখন এই সকল লোক সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ,

দর্শন ও বিজ্ঞানাদি অতি দুরবগাহ্য বিষয় সকলকে সামান্যমাত্র চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন, তখন চেষ্টা ও অভ্যাস করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না, ইহার কোন কারণ নাই।

অনেকে বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব। কোনও কার্য্য সম্ভব বা অসম্ভব, এরূপ বলার অধিকার অপূর্ণ মানবের নাই। তবে যাহা কাহাকে কখনও করিতে দেখে নাই তাহাই আপ ততঃ মূর্খদিগের নিকট অসম্ভব বোধ হইয়া থাকে। মুহূর্ত্তমধ্যে সহস্র-যোজনান্তে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তাড়িতবার্ত্তাবহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কে ইহার সম্ভাবনা বোধ করিয়াছিল? এক্ষণও অনেক মূর্খলোক ইহা অসম্ভব মনে করে। যাহা হউক, যাহা কেহ কখনো করে নাই, তাহাও অসম্ভব বলা যখন অন্যায় হয়, তখন যাহা অনেকে সাধন করিয়াছেন তাহা অসম্ভব বলা গুরুতর মূর্খের কার্য্য। এই ভারতবর্ষেই মহর্ষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্যদিগকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মসাধন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্।

যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাদ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ॥ শ্রুতি। একাগ্র চিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছাকর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

যিনি ভূমা মহান্, তিনি সুখস্বরূপ, ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ, অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। তথা,—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ ॥ শ্রুতি।

তোমাদের মৃত্যুপীড়া না হউক, এজন্য সেই বেদ্য পুরুষকে জান। তথাহি,—

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥

হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ॥

তলবকার উপনিষদ্, ১৩ শ্লোক।

এখানেই তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

(সাধক) কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

এই সকল কথা উপনিষদের উক্তি। আর আর সকল শাস্ত্রই উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

হায়, যাঁহারা লোকসকলকে বার বার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন, যাঁহারা বলিতেছেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহারা বলিতেছেন সেই মহান্ অনন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত জীবের আর সুখ নাই, যাঁহারা সেই পরমাত্মাকে পুত্র, বিত্ত এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ অপেক্ষা প্রিয়তররূপে উপাসনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে উৎসাহিত করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে জানা ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই এবং ইহলোকেই তাঁহাকে জানিতে না পারিলে মহাবিনাশ উপস্থিত হয় বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ সতর্ক করিতেছেন এবং তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া, তাঁহাদেরই আর্য্য নামের গৌরবে মেদিনী কম্পিত করিয়া, অনা-

যাসে দেশবিদেশে প্রচার করিতেছি "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব।" আর আমাদের চারিদিকে কোটী কোটী লোক যে এখনও সেই ব্রহ্মোপাসনা করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন, আমরা অন্ধ হইয়া তাহাও একবার চাহিয়া দেখি না।

আমরা সকলেই বলি, ভারতবর্ষ এক সময়ে পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু বল দেখি, ভারতের উন্নতির মূল কোথায়? আমি বলি, ঐ যে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহলোকেই তাঁহাকে না জানিতে পারিলে মহাবিনাশ উপস্থিত হয়, উহাই ভারতের উন্নতির বীজস্বরূপ ছিল। ভাবিয়া দেখ, যেদিন হইতে ভারত এই ভূমা মহানকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র দেব দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, যে দিন হইতে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক জলন্ত জীবন্ত বেদ নীরব হইয়াছে; যেদিন হইতে এই সাক্ষাৎ জীবনরূপী ব্রহ্মাগ্নি ভারতবাসী নরনারীর আত্মা হইতে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের সৌভাগ্য-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতবাসী ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া অবনতির নিম্ন হইতে নিম্নতরস্তরে পতিত হইতেছে, সেই দিন হইতে মৃত্যু তাহার করাল গ্রাস বিস্তার করিয়া ভারতের সকল সম্পদ কুক্ষি-গত করিয়াছে, সেই দিন হইতে যে বিষম অন্ধকার ভারতের আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে, আমরা এখন সেই ঘোর অন্ধকারে পথ-ভ্রান্ত হইয়া কেবল সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থে মুগ্ধ, ও ছার ইন্দ্রিয়-সুখের বশীভূত হইয়া প্রাণের জ্বালায় বিকট চীৎকার করিয়া ফিরিতেছি, আর চতুর্দ্দিকস্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী মনুষ্যগণ আমাদিগকে বন্য

পশুবোধেই যেন ঘোর তাড়না করিতেছে। অহো, কি ভীষণ দৃশ্য।

আমরা এই হৃদকম্প-জনক দৃশ্যের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

অনেকে বলেন, ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব না হইলেও বিস্তর কষ্টসাধ্য। তাঁহাদের এই কথা স্বীকার করিলেও ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, যাহা ব্যতীত মানবের আর অন্য গতি নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্য, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর বস্তুতে মনকে কতদিন লিপ্ত রাখা যাইবে? মানুষ আহারের জন্য, সুখের জন্য, পরিবার প্রতিপালনের জন্য কোন্ কষ্ট না স্বীকার করিয়া থাকে? কেবল অসার প্রশংসা ও খ্যাতিলাভের জন্য সেই আহার, নিদ্রা, সুখ, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, বিপদ এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, দেশ বিদেশ, জল জঙ্গল, ব্যাঘ্র ভল্লুক, শত্রু মিত্র ভেদ-জ্ঞান করে না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, আদরণীয়, একমাত্র গতিস্বরূপ, নিত্যধন চিরকালের আশ্রয় ও সঙ্গীরূপ ঈশ্বরপদ লাভের জন্য তাহার লক্ষাংশের একাংশ চেষ্টাও না করিয়াই বলিতেছে, "উহা কষ্টসাধ্য।" আর সাকার উপাসনার জন্যও যতটুকু ধৈর্য্য, চেষ্টা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সংযম এবং ত্যাগ-স্বীকার করিতেছে, তাহার একবিন্দুও ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ লাভ করিবার জন্য না করিয়া কষ্টসাধ্য বলা কিরূপে উচিত হয়? যে বস্তু লাভ করা যত কষ্ট, আমরা সে বস্তুর জন্য ততই অধিকতর যত্ন করিয়া থাকি, তাহাতে কখনো বিমুখ হই না। কিন্তু এই ব্রহ্মোপাসনা হইতে কোটী কোটী লোক কেবল যে বিমুখ হই-

যাছে তাহা নহে, পরন্তু কেহ তাহার নাম মাত্র করিলে ক্রোধায আশান্বিত হইয়া একবার শুনিবে, না, তৎপরিবর্ত্তে নানা প্রকার নির্য্যাতন করে। এই সকল লোক আপন মঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-প্রতারিত হইতেছে, কষ্টের ভান করিয়া বিপথে যাইতেছে, কিন্তু সময়ে কে ইহাদিগকে রক্ষা করিবে? যাহারা একেবারে ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া, সকল প্রকার ধর্ম্মানুশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া অনবরত পাপানুষ্ঠানে অসুর-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ভীষণ নরক বদনব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনাকে একান্তই সাধ্যাতিরিক্ত মনে করত আপনার দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিরাশচিত্তে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও একবার মনে করা উচিত—

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদি দেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

কুলার্ণব, ৫ম খ, ১ম উ, ৪৫ শ্লোক।

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি দেবতাগণ এবং সকল পদার্থই নাশ প্রাপ্ত হইবেক, অতএব শ্রেয় অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ এমন আশ্রয় গ্রহণ কর, যাহাতে শ্রেয়ঃ হইবে এবং যাহা অবিনাশী।

মানবাত্মার একমাত্র গতি স্বয়ং পরমেশ্বর। অনন্ত ঈশ্বর ব্যতীত কোন প্রকার সীমাবিশিষ্ট পদার্থ ইহাকে সুখী করিতে পারিবে না।

অনেকে বলেন, "নিরাকারের ধারণা করা যায় না, কাযেই আমরা সাকার পূজা করি।" ঈশ্বর যদি কোন প্রকার আকার-

বহিত হইলেন, রূপ, রস প্রভৃতি কিছুই যখন তাঁহাতে নাই, তখন যে কোন প্রকার সাকার পদার্থকে ধারণা করিতে গেলেই তাঁহাকে ধারণা করা হইল না, তাঁহার উপাসনা করা হইল না,ইহা কি আর বুঝিতে বাকী রহিল? মনে করুন, আপনি একটী রূপের ধ্যান আরম্ভ করিলেন, এ দিকে মনে মনে জানিতেছেন ইহা ঈশ্বর নহে, এ অবস্থায় ঈশ্বর-পিপাসু মন কিরূপে তৃপ্ত হইতে পারে?

যাহার ধ্যান ধারণা করা যায় না, তাহার সহিত আমাদের আত্মার কোনও নিকট সম্বন্ধ থাকা উচিত হয় না। এবং তাহার জন্য কোন প্রকার ব্যস্ত হওয়াও মূর্খতা বই আর কি? কিন্তু যাঁহার কিছুই জানেনা, জগৎ কেন তাঁহার জন্য পাগল হইল? কিছু না দেখিয়াই, না জানিয়াই কি এতদূর হওয়া সম্ভবে? নিতান্ত মূর্খ না হইলে এ কথা কেহ বলিতে পারে না।

যাহা হউক, নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করা যায় কি না, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ধারণা শব্দের অর্থ কি? "আমি কোন পদার্থকে ধারণা করিতেছি" বলিলে কি বুঝা যায়? সকলেই স্বীকার করিতেছেন, সাকার পদার্থের ধারণা সহজ। সুতরাং সাকার পদার্থের বিষয়ই আলোচনা করা যাউক। মনে করুন, আপনার সম্মুখে একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি রহিয়াছে। আপনি বলিলেন, "এটী একটী মনুষ্য", এ স্থলে আপনি কি বুঝিলেন? তাহার রূপ দেখিতেছেন, তাহার শব্দ শুনিতেছেন, তাহার শরীরের গন্ধও হয়ত আঘ্রাণ করিতেছেন, ইচ্ছা করিলে রসনাদ্বারা রসগ্রহণও

করিতে পারেন, হস্তদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া স্পর্শজ্ঞানও লাভ করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত আপনার ইন্দ্রিয়গণ আর কিছুই করিতে পারিতেছে না। তবে কি সেই মনুষ্যটী রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই পাঁচটী জিনিসের সমষ্টি মাত্র? আপনি কি কেবলমাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের ধারণা করিতে পারেন? একজন প্রকৃতিস্থ লোক অবশ্য বলিবেন, "কোন পদার্থের অবলম্বন ব্যতিরেকে তাহারা থাকিতেও পারে না, এবং আমরা তাহাদের স্বতন্ত্র ধারণাও করিতে পারি না"। ফলতঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা রূপরসাদি গ্রহণ করিতে পারি এবং কোথাও রূপ রসাদি দেখিলে আমরা বলি "এটী একটী জড় পদার্থ"। কিন্তু যে পদার্থের রূপাদির গ্রহণ করিতেছি, সে পদার্থটী মূলে কি প্রকার? ইহার উত্তরে কেহই কিছু ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন না। একটী পদার্থ আছে, যাহার এই প্রকার রূপ, এই প্রকার রস ইত্যাদি মাত্র বলা যায়, অর্থাৎ রূপাদিদ্বারা স্থূল জড়কে লক্ষ্য করা যায় মাত্র।

পরমাণু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। তাহা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না। কিন্তু তাহার অস্তিত্বস্বীকার সকলেই করেন। এক্ষণ জিজ্ঞাসা করি, তাহার ধারণাটী কি প্রকারে করেন? অবশ্য উত্তর এই হইবে, "পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, সুতরাং তাহার অস্তিত্বসম্বন্ধে মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তদতিরিক্ত তাহার ধ্যান করিতে পারি না।"

একটী মনুষ্য কার্য্য করিতেছে। আপনি বলিলেন, "ইহার জীবন আছে।" আর একজন অসাড় হইয়া রহিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই, বলিলেন "সে মরিয়া গিয়াছে।" ভাল জীবনটা

কি প্রকার পদার্থ? তাহার কি রূপ রস আছে? কখনই না। তবে সে ঐ দেহে আছে কি না, কি প্রকারে জানিলেন? না জীবনের কার্য্য দ্বারা তাহার অস্তিত্ব জানিতেছেন। যেখানে সে কার্য্য নাই, সেখানে জীবনও নাই ইহা নিশ্চয়। জীবনটা ইন্দ্রিয়-গোচর না হউক, বুদ্ধি-গোচর বটে।

এক্ষণ দেখুন, মনোমধ্যে জড়পদার্থের প্রতিবিম্ব কল্পনা করিয়া তাহার রূপ দেখা যায়; কিন্তু কোন প্রকার জড়পদার্থের অস্তিত্ব ব্যতীত কিছুই ধারণা করা যায় না। আর কেবল কতকগুলি লক্ষণদ্বারা জড়ের অস্তিত্ব বোধ করি। সেইরূপ অন্য কতকগুলি লক্ষণদ্বারা চৈতন্য পদার্থের অনুভব করিয়া থাকি। এই অস্তিত্বে দৃঢ় প্রত্যয় এবং সেই সেই পদার্থের কতকগুলি ব্যবহারিক গুণ ব্যতীত আমরা অন্য কোন প্রকার ধারণা করিতে পারি না। যাঁহারা মনে করেন, মনোমধ্যে কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব কল্পনা করাই ধ্যান করা বা ধারণা করা, তাঁহারা অতিশয় ভুল করেন। কোন পদার্থের অস্তিত্ব এবং গুণাবলীর চিন্তা করাকেই তাহার ধ্যান করা বলে। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিস্ফুট করিতেছি। সর্পের ছবি দেখিলে, বা মনে মনে তাহার একটী ছবি কল্পনা করিলে (যতক্ষণ না তাহার ভয়ানক প্রকৃতি চিন্তা করা যায়, ততক্ষণ) ভয় হয় না। কিন্তু যখন প্রত্যয় জন্মে যে, এখানে সাপ আছে, এবং যখন তাহার বিষের প্রাণ-নাশিকা শক্তির চিন্তা করা যায়, তখনই ভয়ের সঞ্চার হয়। সেইরূপ এই বিশ্বকার্য্য অবলোকন করিয়া যখন চৈতন্যময় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমানের অস্তিত্বে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে এবং যখন তাঁহার আশ্চর্য্য স্বরূপ ও কার্য্যের চিন্তা করা যায়, তখনি তাঁহার

ধ্যান করা হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য ধ্যান নাই। একাগ্র চিত্তে এইরূপ ধ্যান করিলে ঈশ্বর-দর্শন হয় এবং পাপী পুণ্যাত্মা হয়, সমস্ত বাসনা-বন্ধন ছিন্ন হইয়া সাধক জীবন্মুক্ত হয়েন এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তাঁহার রূপ নাই, প্রতিমাও নাই, প্রতিবিম্বও হয় না, সেধ্যানও হয় না। যে সকল জড়পদার্থের রূপ আছে, তাহাদের ধ্যান-কালে রূপও মনে পড়ে। যাহার রূপ নাই, তাহার রূপের প্রয়োজনও নাই। রূপব্যতীত ধ্যান হয় না, একথার কোন মূল্যও নাই।

পরমেশ্বরের ধ্যান রূপের দ্বারা হয় না। যথা—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

কঠোপনিষদ্, ৬ষ্ঠ বল্লী, ১২ শ্লোক।

তিনি বাক্য,মন কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি বলে "তিনি আছেন," তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি-দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন?

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্,৩য় মু, ৮ শ্লোক।

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপ-রাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাহ্যবিষয়-রাগাদিদ্বারা কলুষিত জ্ঞানকে বিশুদ্ধ করিয়া শুদ্ধ-সত্ব ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥

তলবকার উপনিষদ্, ১৩ শ্লোক।

ধীর সাধকেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে একমাত্র পর-মেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া, এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তিধীরাস্তেষাং শান্তি শাশ্বতী নেতরেষাং॥

কঠোপনিষদ্, ৫ম বল্লী, ১৩ শ্লোক।

তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে উপলব্ধি করেন, তাঁহা-দের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি।

তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ।

অনেকে বলিয়া থাকেন, আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধীন এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ব্যতীত আর কিছুই জানিতে পারি না। কিন্তু ইহা অতি মিথ্যা কথা। স্নেহ, ভয, ক্রোধ, বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতি বস্তুকে কেহ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ইহাদের রূপ রসাদি কিছুই নাই। তবে আমরা ইহাদিগকে জানি কিরূপে? সকলেই জানেন, যখন নিজের মনে এই সকল ভাবের উদয় হয়, তখন তাহা আপনা আপনিই জানা যায়। আর অন্যের মনে যখন ঐ সকল ভাব হয়, তখন তাহারা যে তদনুরূপ কার্য্য করে, সেই কার্য্য দেখিয়াই আমরা তাহাদের মনের ঐ সকল ভাব বুঝিতে পারি। এই সকল বস্তু আমরা মন ও জ্ঞানদ্বারাই জানি। সুতরাং পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়ব্যতীত মন আরও একটী অন্ত-

বিন্দ্রিয় রহিয়াছে, তদ্দ্বারাই নিরাকার পদার্থের জ্ঞান লাভ করি। ইহাকেই মানস প্রত্যক্ষ বলে। মনদ্বারা যে আমরা কেবল নিরাকারের জ্ঞান লাভ করি, তাহা নহে, সাকারের জ্ঞানও মন না থাকিলে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়দ্বারা হইতে পারে না। সকলেই জানেন, অন্যমনস্ক থাকিলে, চক্ষু খোলা থাকিতেও পদার্থের জ্ঞান হয় না, কর্ণ অবারিত থাকিতেও শব্দ শোনা যায় না। ফলতঃ মন না থাকিলে কিছুই হয় না। বাহ্যিক পদার্থের জ্ঞান ইন্দ্রিয়-পথে লাভ করা যায় এবং অন্তরের বিষয় মনদ্বারাই জানা যায়। মনের মধ্যে যতক্ষণ অস্তিত্ববিষয়ে প্রতীতি না জন্মে, ততক্ষণ পদার্থ ইন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে থাকিলেও তদ্বারা আমাদের কিছুই কায হইতে পারে না। গৃহের মধ্যে সর্প আছে, কিন্তু আমি জানিতে পারি নাই, এ অবস্থায় মনে ভয়ও হয় না। আবার মনে যদি প্রতীতি জন্মে, তবে ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিলেও প্রত্যক্ষ করার মত ফল হয়। গৃহে সর্প আছে, আমি দেখি নাই, কিন্তু কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনিয়াছি, এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ভয় অবশ্যই হইবে। আমাদের দেশে সাধারণ লোকে বড় ভূতের ভয় করে। কিন্তু ভূতের তো আকার নাই। কিন্তু অমুক স্থানে ভূত আছে, এই কথা শুনিলেই ভয়ে সেখানে যায় না। ফলতঃ সাকার হউক নিরাকার হউক, মনে প্রতীতি জন্মিলেই কার্য্য হইল। মনের মধ্যে পদার্থের জ্ঞান হওয়াই প্রয়োজন।

এক্ষণ বেশ দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি পদার্থের রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হইলে, রূপাদির আধার-স্বরূপ সেই পদার্থগুলির জ্ঞান আমাদের মনে হয়। তাহাদের জড়-

মূর্ত্তি আছে, সুতরাং প্রতিমূর্ত্তিও করা যায়। আবও কতকগুলি জড এত সূক্ষ্ম যে,তাহাদেব মূর্ত্তি নাই, প্রতিমূর্ত্তিও হয না,—যেমন আলোক, উত্তাপ, বাযু, পরমাণু ইত্যাদি। আব কতকগুলি নিরাকার চৈতন্য পদার্থ আছে, যাহাদেব জ্ঞান নিজের ভিতরে সাক্ষাৎ ভাবে হয, এবং অন্যের ভিতরে তাহাদের কার্য্য দেখিযা হয। ইহাদেরও প্রতিমূর্ত্তি অসম্ভব। যেমন আত্মা, জ্ঞান, প্রেম, ক্রোধ, ভয ইত্যাদি।

জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায, সামান্য ও বিশেষ জ্ঞান। কেবলমাত্র বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করাকে তাহার সামান্য জ্ঞান বলা যায়। আর তাহার স্বভাব, গুণ ও ব্যবহারাদি জানাকে তাহার বিশেষ জ্ঞান বলে। বিশেষ জ্ঞান কিছুমাত্র না থাকিলে, সামান্য জ্ঞানদ্বারা কোনই কায হয় না। যেমন ক্ষুদ্র শিশু সর্প দেখিলে, তাহার স্বভাব জানেনা বলিয়া ভীত বা সতর্ক হয না। আবার সেই বিশেষ জ্ঞানে যদি ভ্রম বা ত্রুটী থাকে, তাহাতেও কার্য্য হয না। যেমন হীরকের বহু-মূল্যত্ব যে না জানে, সে তাহার উজ্জ্বলতাতে মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার মূল্য না বোঝাতে হীরক ঘরে থাকিতেও সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না, তাহার দারিদ্র্য ঘোচেনা। অভিজ্ঞতা বা শিক্ষাদ্বারা বিশেষ জ্ঞান উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগের নানা প্রকার উপকারে আসিতে থাকে।

ঈশ্বরসম্বন্ধেও এইরূপ। যে কোন প্রকারে হউক, সকল মনুষ্যের মনেই এরূপ বিশ্বাস আছে যে, মানুষ ক্ষুদ্র, এবং অদৃশ্য কোন শক্তির অধীন। ইহাকে ঈশ্বরসম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান বলা যায়। তার পর, ঈশ্বরসম্বন্ধে যে যাহা বোঝে, সে

সেইরূপ আচরণ করে। কেহ বা তাঁহাকে বহু বলিয়া মনে করে, কেহ এক মনে করে, কেহ ভয়ানক মনে করিয়া সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে এবং নানাপ্রকার জীবহত্যাদি করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিতে চায়, আবার কেহবা তাঁহাকে "আত্মীয় হ'তে আত্মীয়" মনে করিয়া প্রীতিদ্বারাই সেবা করে। কেহ বা তিনি দূরে আছেন বলিয়া ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিতেছে, কেহবা তাঁহাকে স্বীয় অন্তরে অনুভব করিয়া চরিতার্থ হইতেছে। যাহাহউক, ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের দুই রকমে হয়। এক আত্মাতে সাক্ষাৎ ভাবে, অপর জগতের সৃষ্টিকার্য্য ও কৌশলাদি দেখিয়া। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত আত্মপ্রত্যয়ই উত্তম। কেননা উহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার গভীর অধ্যাত্ম-যোগ সাধিত হয়।

যেমন কোন ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া তাহার অন্তরস্থ অদৃশ্য জীবন, আত্মা, জ্ঞান ইত্যাদি অনুভব করি, সেইরূপ এই বিশ্বের কার্য্য দেখিয়া বিশ্বাত্মা ও তাঁহার জ্ঞানাদির অনুভব করি। আবার যেমন আপনার প্রাণ ও আত্মা সাক্ষাৎ ভাবে অনুভব করি, প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আত্মা পরমাত্মাকেও সেইরূপ সাক্ষাৎ ভাবে অনুভব করি। কিন্তু অভিজ্ঞতা অথবা অপরের নিকট শিক্ষা করা প্রয়োজন। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহাদের নিকট ইহা শিক্ষা করিতে হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান না হইলে কোন উপকার হয় না। তিনি ভিন্ন জীবের গতি মুক্তি নাই, ইহা যে না জানে, না বুঝিতে পারে, সেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। তাঁহাকে যে আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে না পারে,তাহার শাশ্বতী শান্তি লাভ হইতে

পারে না। এই বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। তাঁহার বিষয়ে চিন্তা, শিক্ষা ও আলোচনা করিতে করিতে এই বিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিজ্ঞানকেই ধারণা বলে। তাঁহার চিন্তাদিকে এবং তাঁহার ইচ্ছা যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তদনুরূপ কার্য্য করাকেই উপাসনা বলে। ইহার মধ্যে প্রতিমার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, চক্ষুদ্বারা কেহই দেখিতে পায় না। সূক্ষ্ম জ্ঞান-দৃষ্টিতে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। নতুবা সবই অন্ধকার।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

কঠোপনিষদ্, ৩য় বল্লী, ১২ শ্লোক।

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন থাকাতে প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ॥

কঠ, ৬ষ্ঠ বল্লী, ৯ম শ্লোক।

(এই পরমাত্মা) হৃদগত সংশয়-রহিত বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥

দ্বিতীয় মুণ্ডক, ৭ম শ্লোক।

ধীরেরা বিজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।

সত্যেন লভ্যস্তপসাহ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন॥

৩য় মুণ্ডক, ৫ম শ্লোক।

সত্যাচরণ, একাগ্রতা এবং সম্যক জ্ঞানদ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তেভবন্তি, অথেতরে দুঃখমিবাপিয়ন্তি ॥

যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়। কেহ কেহ বলেন, দয়া স্নেহাদির মূর্ত্তি নাই বটে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই সাকারকে অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং সাকার অবলম্বনব্যতীত নিরাকারের ধারণা করা যায় না। একটু চিন্তা করিলেই প্রতীত হইবে যে, আত্মা, দয়া, স্নেহ, ইহাদের নিজের কোন মূর্ত্তি নাই। তবে কোন মূর্ত্তিবিশিষ্ট পদার্থের ভিতর দিয়া তাহাদিগের কার্য্য না দেখিলে, আমরা তাহাদের অস্তিত্বের জ্ঞান পাই না। কিন্তু তাই বলিয়া সেই সকল মূর্ত্তিকেও দয়া. স্নেহ, ইত্যাদি বলিতে পারি না। এই বলি যে, তাহারা মূর্ত্তিতে আছে কিন্তু মূর্ত্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ। সেইরূপ এই বিশ্বের ভিতরে ঈশ্বরের কার্য্য দেখিয়াই বলি, ইহার ভিতরে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু এই জড় বিশ্ব হইতে তিনি স্বতন্ত্র, পৃথক। আবার স্বীয় আত্মার ভিতরে তো তাঁহাকে আত্মার আত্মাস্বরূপেই উপলব্ধি হয়। যদি এই বিশ্ব, এই আত্মা, কিছুই না থাকিত, তবে কেই বা তাঁহাকে জানিত, আর কি উপায়েই বা জানিত? যেমন দেহ হইতে দেহী আত্মা পৃথক, সেইরূপ বিশ্ব হইতে বিশ্বাত্মাও পৃথক্। জ্ঞান আরও একটু উন্নত হইলে জানা যায় যে, দেহী দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, ক্ষুদ্র অস্বতন্ত্র; কিন্তু বিশ্বাত্মা বিশ্বের স্রষ্টা, পূর্ণ, স্বাধীন, নির্লিপ্ত। বেদান্তসূত্রেও এই আপত্তির মীমাংসা আছে। প্রশ্ন হইল, ঈশ্বর যদি নিরাকার এবং অজড়

হইলেন, তিনি যদি নামরূপ-ময় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইলেন, তবে তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় কি প্রকারে? উত্তর:—

জন্মাদ্যস্য যতঃ। বেদান্তসূত্র, ১অ, ১পা, ২য় সূ।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি,স্থিতি ও নাশ, হয় তিনি ব্রহ্ম। বিশ্বের সৃষ্ট্যাদিদ্বারা ব্রহ্ম নিশ্চয় করি, যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে, কার্য্য না থাকিলে কারণও থাকে না।

পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিগুলিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাকারোপাসনাদ্বারা আদৌ ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারেনা। যতক্ষণ ঈশ্বরকে সত্য এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া উপলব্ধি না করা যায়, ততক্ষণ তাঁহার উপাসনাই হইতে পারেনা। সুতরাং সাকার মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করাতেও ঈশ্বরকে একদেশ-ব্যাপী বলিয়া গ্রহণ করা হয় বলিয়া তাহাও ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারেনা। আর, ঈশ্বর প্রতিবস্তুতেই আছেন, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও আবাহনবিসর্জ্জনাদি অসম্ভব হইয়া উঠে। মূর্ত্তি পূজা না করিয়া মূর্ত্তিতে ঈশ্বর আছেন, সেই ঈশ্বরের পূজা করি বলিলেও উপাসক নিরাপদ নহেন। কেননা তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে পারি যে, মূর্ত্তিস্থ ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা কি রূপে করিতে পার? মূর্ত্তির ধ্যান করিলে জড়োপাসনাই হয়, কেবল মাত্র ঈশ্বরের ধ্যান তো নিজেই অসম্ভব বলিতেছ। আর যদিবল, কেবল মূর্ত্তিরও ধ্যান করিনা, কেবল আত্মারও ধ্যান করিনা,কিন্তু আত্মাবিশিষ্ট অর্থাৎ জীবন্ত মূর্ত্তির ধ্যান করি; তাহাতেও এই বলা যায় যে,ঈশ্বর যখন জীবন্ত মূর্ত্তিও নহেন,তখন উহাতেও ঈশ্বরের ধ্যান করা হইল না। আরও দেখ, মূর্ত্তিতে ঈশ্বর আছেন, এই বিশ্বাস লইয়া যদি তাঁহাকে মনের কথা বলিতে পার,

তবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই ঈশ্বর আছেন,—স্বীয় অন্তরেই তিনি আছেন জানিয়া কেন না তাঁহাকে মনের কথা বলিতে পারিবে? যে সাধক বিশ্বাস করেন ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই ঈশ্বর আছেন, তাঁহার ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতেই বা তৃপ্তি হইবে কেন? আর যিনি তাহা না বুঝিতে পারেন, তাঁহার মূর্ত্তিতেই বা কি হইবে? অগ্রে জ্ঞানকে প্রসন্ন করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন, সকলি যখন ব্রহ্মময়, তখন সকল পদার্থকেই ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করা যাইতে পারে। কিন্তু একথার কোন মূল্য নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই আছেন বলিয়া সকলকে ব্রহ্মময় বলা হয়। সকলই ব্রহ্মময় বলিলে এরূপ বুঝায়না যে, নামরূপবিশিষ্ট সকল পদার্থই ব্রহ্ম। কেননা নামরূপবিশিষ্ট কোন পদার্থই ব্রহ্ম নহে,ইহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পুনশ্চ, তাহাতে অনেক ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু "একমেবোদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আর, নামরূপবিশিষ্ট সকলই মিথ্যা। মিথ্যার উপাসনাদ্বারা কিরূপে সত্যকে পাওয়া যায়?

নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ ॥

কঠ, ২য় বল্লী, ১০ শ্লোক।

অসত্য নামরূপের উপাসনাদ্বারা সত্য পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না।

আবার অনেককে এরূপও বলিতে শোনা যায় যে, পরমেশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্ তখন তিনি সাকারও হইতে পারেন। এই যুক্তি শাস্ত্র ও অভিজ্ঞতা উভয়েরই প্রতিকূল। বশিষ্ঠ,যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ কোথাও এরূপ বলেন

নাই ? তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন যে, যাবতীয় সাকার পদার্থ এবং অদৃশ্য পরমাণু হইতে তিনি পৃথক। ঈশ্বর সত্য, নিত্য, অব্যয়। যাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবে, সে সকলই অসত্য, অনিত্য এবং ব্যয়শীল। সত্যের বিভিন্ন রূপ কখনি হয়না। সত্য পদার্থ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা গ্রহণ করেনা। যাহার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে স্বরূপ বলা যায়না। ঈশ্বর যদি আপন স্বরূপের পরিবর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সত্য-স্বরূপ বলা যাইত না। তিনি বিশ্বের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তবুও দেখা যায় যে, তিনি এক অখণ্ডনীয় নিয়মে সকলকে চালিত করিতেছেন। তিনি কখনো নিয়মভঙ্গ করেন না। আম্রবৃক্ষে কখনো তিনি কদলী ফলান না। জড়ের সম্বন্ধেই যিনি এক অখণ্ডনীয় নিয়ম রাখিয়াছেন, নিজের সম্বন্ধে যে তিনি নিয়ম এবং শৃঙ্খলা-হীন হইবেন, ইহা সম্পূর্ণ মূর্খ-জনোচিত কথা। বিশেষতঃ সাকার ও নিরাকার পরস্পর বীপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট। সাকার অবশ্যই ক্ষুদ্র হইবে, ইহা তাহারই নিয়ম। একদিকে তিনি যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, অপর দিকে তিনি তেমনি সত্য। তিনি সত্য ব্যতীত মিথ্যা হইয়া সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দেন না। যাহা স্বরূপ, তাহাই সত্য। স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয়না। সত্যই বিজ্ঞান, সত্যই শাস্ত্র। তিনি বিজ্ঞানের অতীত হইলেও বিজ্ঞান তাঁহারই নিয়ম বটে। যাহার বিজ্ঞান নাই, তাহার শক্তিও স্বীকার্য্য নহে। বিজ্ঞানের দ্বারাই শক্তির পরিচয়। তিনি মানুষকে যে বিজ্ঞা-নের দ্বারা সত্য জানিতে দিয়াছেন, স্বয়ং সেই বিজ্ঞানের বীপরীত কার্য্য করিতেছেন, ও করিতে পারেন বলিলে তাঁহাকে

অসত্য, এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়। বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরস্পরকে অতিক্রম করিতে পারে না। অভিজ্ঞানই পরিপক্ক অবস্থায় বিজ্ঞান-রূপ ধারণ করে। সেই অভিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিপরীত হইয়া, বিজ্ঞানকে ফাঁকি দিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতে পারেন বলা একান্ত অজ্ঞের কথা। শাস্ত্রেও আছে,—

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥

বেদান্তসূত্র, ৩পা, ২অ, ১১ সূ।

পরমেশ্বরের উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ এককালে সাকার ও নিরাকার হওয়া উপাধিদ্বারাও সম্ভব হয় না, বস্তুতঃ হইবার সম্ভাবনা কি? যেহেতু উপনিষদসকল এক বাক্যে তাঁহার এক অবস্থা এবং সর্ব্বোপাধিশূন্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। ফলতঃ ইহা কে না বোঝে যে, এক বস্তুর একই কালে আকারবিশিষ্ট ও আকারবর্জ্জিত হওয়া কদাপি যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না। তবে যে, শাস্ত্রে তাঁহাকে স্থানে স্থানে সাকার পদার্থ, যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, জল, অন্ন, ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব বুঝাইবার জন্য।—

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ ॥

বেদান্ত-সূত্র, ৩অ, ২পা, ৩৮সূ।

অর্থ:—বেদে কহেন ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হয়েন, এ সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্ব বর্ণনদ্বারা তাঁহার সর্ব্বগতত্ব প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুত তিনি কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যময়, যথা বৃহদারণ্যকে,—

অয়মাত্মান্তরো বাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ॥

এই পরমাত্মা অন্তরে বাহিরে কেবল চৈতন্যময়। এ

বিষয়ে পূর্ব্বেও বিস্তর আলোচনা করা গিয়াছে, সুতরাং পুনর্ব্বার তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আরও, তাঁহার সাকার হইবার কোন কারণও নাই। কেহ কেহ বলেন, মানুষের তাঁহাকে পাইবার কোন পন্থা নাই, সেই জন্যই তিনি সাকার হইয়া মানুষকে দেখা দেন। এই কথায় তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাকেই নষ্ট করা হয়। কেননা তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমানই হইলেন, তখন নিজের স্বরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া সাধকের ভিতরে কি এমন কোন শক্তি দিতে পারেন না, যদ্দারা সাধক তাঁহাকে পাইতে পারে? নিজের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করা, এবং সাধককে স্বরূপ ধরিবার ক্ষমতা দেওয়া, ইহার কোন্‌টীতে অধিক ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হয়? হায়। সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও, সাধকের জন্য অবশেষে তাঁহাকে স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইল। কিন্তু সাধককে আর স্বরূপ বুঝিবার ক্ষমতা দিতে পারিলেন না!! ফলতঃ প্রকৃত সাধক হইলে একথা কাহারও মুখে আসিতে পারে না। সাধকগণ চিরকালই বলিতেছেন, তিনি অন্ধকে চক্ষু, এবং অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিয়া থাকেন। সাধকের জন্য তিনি তাঁহার স্থান পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু সাধককেই তাঁহার মহাসিংহাসন সমীপে যাওয়ার অধিকার দিয়া ধন্য করেন।

অনেকে বলেন, ঈশ্বর সময় সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং অবতীর্ণ রূপের পূজা করিলে ঈশ্বরোপাসনা হইতে পারে। এই অবতার বাস্তবিক কি, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নহে; তবে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু বলা যাইবে। আপাততঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অব-

তীর্ণ রূপ পূর্ণ ব্রহ্ম যা নিত্য ব্রহ্ম নহেন। পূর্ণ ব্রহ্মের জন্ম, জরা, মৃত্যু ও রূপাদি কিছুই নাই, যথা—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ ॥

কঠোপনিষদ্, ২য় বল্লী, ১৮ শ্লোক।

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই। তথাহি শ্রুতি—

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ ॥

এই সেতু-স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা, মৃত্যু, শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না।

"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্ব্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর, অমর, অশোক ও ক্ষুৎ-পিপাসাবর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে।

অবতীর্ণ ব্রহ্মের জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, অজ্ঞান, পাপ, ক্ষুৎপিপাসা, অসত্যাচরণ সকলি দেখা যায়। অবতীর্ণ ব্রহ্ম নামরূপের অধীন, এবং স্থান ও কালের অধীন। সুতরাং অবতীর্ণ ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না।

যদি বল, জন্মাদি ব্রহ্মের লীলা মাত্র, তাহা হইলে ইহাও তো সত্য যে, জগতের সকলি ব্রহ্মের লীলা মাত্র। কিন্তু লীলার উপাসনাতে কিরূপে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে? বাস্তবিক অবতারবাদী শাস্ত্রসকলও অবতারকে ব্রহ্মের লীলা মাত্র বুঝিতেই উপদেশ দিয়াছেন, তাহার পূজার উপদেশ

দেন নাই। দশ অবতারের মধ্যে কূর্ম্ম, বরাহ, মৎস্য নৃসিংহ, পরশুরাম প্রভৃতি অধিকাংশ অবতারের উপাসনা এদেশে প্রচলিত নাই। পূজার সময়ে ঐ সমস্ত লীলার উল্লেখ করা হয় মাত্র। ফলতঃ লীলাই বল আর যাই বল, ঐ সকল ব্যক্তিতে যখন ঈশ্বরত্বের কোন চিহ্নই নাই, পরন্তু সকলি মানুষের মত,কেবল মাত্র জ্ঞান ও বুদ্ধি-বলে সাধারণ লোক অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বলিয় উপাসনা করা কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কোথাও কৃষ্ণের জড়শরীরের ধ্যানাদির উপদেশ নাই। বরং তিনি আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, এবং সকলি তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, এইরূপে তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে। যাহারা তাঁহাকে মনুষ্য-মূর্ত্তিতে দেখে, তাহাদিগকে তিনি মূঢ় বলিয়াছেন, যথা—

> অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ
> পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
>
> ভগবদ্গীতা, ৭ম অ, ২৪ শ্লোক।

অজ্ঞান ব্যক্তিরা আমার নিরতিশয় অব্যয় ভাব এবং পরমাত্ম-স্বরূপ না জানিয়া অব্যক্ত আমাকে মনুষ্য-মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপে মনে করে। পুনশ্চ,—

> অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
> পরং ভাবমজানন্তোমম ভূতমহেশ্বরম্॥
>
> গীতা, ৯ম অ, ১১ শ্লোক।

আমার ভূত-মহেশ্বর পরমাত্মস্বরূপ না জানিয়া মূঢ়গণ, আমাকে মানুষভাবে দেখিয়া অবমাননা করে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"। সুতরাং অবতার মানিলেও, মায়ার উপাসনা মানিবার কারণ কি? মায়াতীত "পরং ভাবকে" জানা এবং সেই ভাবের উপাসনা করাই আমাদের প্রয়োজন। যে অংশ মায়া-সম্ভূত, সে অংশ অপর মনুষ্যেরই ন্যায় সকল কার্য্য করিয়াছে। তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, শোক, অজ্ঞানতা সকলই দেখা যায়। জ্ঞানোপার্জ্জন, যুদ্ধ-বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, এ সকলও অন্যান্য মানুষের মত করিয়াছিলেন। অবশেষে গান্ধারীর অভিশাপে স্বীয় বংশনাশজনিত শোকেও অভিভূত হইয়াছিলেন। কুটীলতা কপটতাও বিস্তর করিয়াছেন। মহাভারতের পাঠকমাত্রই ইহা অবগত আছেন। যাঁহারা এই সকল ভাবসমন্বিত দ্বিভুজ মুরলীধর, নামও উপাধিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম জ্ঞান করেন, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যোগারূঢ় হইয়া ব্রহ্মভাবে অর্জ্জুনকে যে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞান-সম্মত কার্য্য করিলে শরীরধারী কৃষ্ণের উপাসনা করা অসম্ভব। তিনি আপনাকে ঈশ্বরভাবে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং যেখানে 'আমি' 'আমার' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে মনুষ্যরূপী কৃষ্ণকে না বুঝিয়া 'পরমেশ্বর', 'পরমেশ্বরের' ইত্যাদি তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ও স্বামীর টীকা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার প্রমাণ অবশ্যই পাইয়াছেন। আর তিনি কোথাও প্রতিমাপূজার উপদেশ করেন নাই, বরং

তাহা নিন্দাই করিয়াছেন। "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং" "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বেই তাহা দেখান হইযাছে। পুনশ্চ,—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি॥

শারীরিকভাষ্য-ধৃত স্মৃতি।

অর্থঃ—হে নারদ,সর্ব্বভূতগুণবিশিষ্ট আমাকে যে দেখিতেছ, আমি এই মায়ার সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু আমাকে এরূপ যথার্থ জানিবে না।

কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সেইরূপ নিজকে, সূর্য্য, মরীচি, চন্দ্র, বেদ, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, পর্ব্বত, বৃক্ষ, অশ্ব, গজ, রুদ্র, সর্প, গাভী, সিংহ, পক্ষী, মকর, যম, দ্যূত, তেজ, সকলি বলিয়াছেন। (গীতা ১০ম অধ্যায় দেখ)

এক্ষণ কৃষ্ণ বলিলে কি একটী বিশেষ জড়মূর্ত্তি-বিশিষ্ট মনুষ্যকে বুঝিতে হইবে? ঐ অধ্যায়ে তিনি আরও বলিয়াছেন,

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

আমি বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব এবং পাণ্ডবকুলে ধনঞ্জয়। পুনশ্চ,

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥

ভাগবত, ১০মস্ক, ৮৫ অধ্যায়।

হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি, তোমরা, এই আর্য্য বলদেব, আর এই সকল দ্বারকাবাসী, অধিক কি, এই চরাচর সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

আবার স্থানে স্থানে তিনি ব্রহ্মকে 'তিনি' বলিয়াও বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায় দেখ।)

যদি পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র শরীরবিশিষ্ট কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিতে হয়, তবে এ সকল কথা কিরূপে সত্য হয়? ঈশ্বরকে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী না বলিলে এ সকল উক্তি নিতান্তই অসার হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী আত্মা রূপে জানিলে একপ উক্তি দোষাবহ নহে। শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন কৃষ্ণের শরীরে সেইরূপ সর্ব্বভূতেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা জানিয়াও যাঁহারা কেবল কৃষ্ণমূর্ত্তি বিনা উপাসনা করিতে পারেন না, তাঁহারা কৃষ্ণের দোহাই দিয়া আত্ম-প্রতারণা করিতেছেন বই আর কি বলা যায়?

যে বেদান্ত সমস্ত হিন্দুর মান্য, তাহাতে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজার উপদেশ নাই। দশোপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্যে এই মাত্র আছে—

তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বাবাচাপিপাস এব স বভূব সোহন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি॥

আঙ্গিরসের বংশজাত ঘোরনামক ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ-যজ্ঞ-বিদ্যার উপদেশে কহিলেন, "মরণ সময়ে 'অক্ষিতমসি' 'অচ্যুতমসি' 'প্রাণসংশিতমসি' এই তিন মন্ত্রের জপ করিবে"। কৃষ্ণ এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যায় নিস্পৃহ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যাগযজ্ঞাদি করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানেন।

তিনি যে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, তাহারও প্রমাণ আছে। কৃষ্ণকে নারদ দেখিতেছেন, যথা—

কাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগযতং ॥
ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ॥

ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, ৬৯ অধ্যায়।

কোথাও সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্ম-মন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথাও প্রকৃতির পর যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া-ছেন, আমি লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই এই সকল কর্ম্ম করি। বাস্তবিক যদি ইহা গ্রহণ করিতে হয়, তবে তিনি যে রূপে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন ও ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন, সকল-কারই তাই করা উচিত। অবতারবাদীকেও বলি, পরমাত্মা মায়াদ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সেই মায়ার উপাসনা করিলে কি হইবে? সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন, এই উপদেশ অবগত হইয়া, এই রূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে তামসিক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই প্রতিমাদির উপাসনা করিয়া আপন গুরুর কলঙ্ক করা উচিত হয় না।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম ॥

গীতা, ১৮শ অধ্যায়, ২২ শ্লোক।

কেবল প্রতিমাদিতে পূর্ণরূপে ঈশ্বর আছেন, এইরূপ অযৌ-ক্তিক পরমার্থাবলম্বন-শূন্য যে তুচ্ছজ্ঞান, তাহা তামসিক।

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন অবতার বলা হইয়াছে,

ব্যাসাদিকেও সেইরূপ অবতার বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাসাদিকে কেন পরব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা কর না? আবার শ্রীকৃষ্ণকে অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা হীনও করা হইয়াছে। যথা সৌপ্তিকে,

প্রাদুরাসন্ হৃষিকেশঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥

মহাদেব হইতে শত সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন।

দান ধর্ম্মে—ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেবচ।

যে মহাদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতির স্রষ্টা এবং প্রভু।

কালীপদ-প্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ।

নির্ব্বাণ।

তিনি (কৃষ্ণ) কালীপদ-প্রসাদে লোকপালক হইয়াছেন। এইরূপে আরও বিস্তর আছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য, এ সকল কি শাস্ত্র নহে? শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া অনর্থক গোল করা উচিত নহে।

সাকারোপাসনায় ঈশ্বরোপাসনা হয় না, ইহা এক্ষণ উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইল। শাস্ত্রে কোথাও এরূপ উপদেশ নাই যে, ব্রহ্ম-জ্ঞান না হইলেও সাকারোপাসনাদ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হয়। ঐ সকল উপাসনার বিস্তর ফল কথিত আছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ফল হয়, এরূপ কোথাও নাই। এই সকল কর্ম্মের ফল সীমাবিশিষ্ট এবং উহার ক্ষয় আছে। ফল-ক্ষয়ে পুনরায় জীবকে দুর্গতিপূর্ণ সংসারে আসিতে হয় বলিয়া-ছেন। যথা—

"যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা ইত্যাদি।" (১১ পৃষ্ঠা দেখ।)

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘনামানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি॥

মুণ্ডকোপনিষদ্‌, ২য় মুণ্ডক; ৭, ৮, ১০ শ্লোক।

অষ্টাদশাঙ্গ যে জ্ঞানহীন যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, সে সকল নশ্বর। এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রেয়ঃ করিয়া জানে, তাহারা ফলভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম, জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

আর, যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে, "আমরা পণ্ডিত এবং জ্ঞানী", সেই মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করে, যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধ গমন করিলে কেহই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না, অথচ পথে নানা প্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

যে বিমূঢ়েরা শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি এবং স্মৃত্যুক্ত কূপোৎসর্গাদি কর্ম্মকেই পরমার্থসাধন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, আর তদপেক্ষা অন্য পুরুষার্থ নাই, এরূপ বলে, তাহারা কর্ম্মফল ভোগের আয়তন স্বর্গে ফলভোগ করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই মনুষ্যলোক কিম্বা এতদপেক্ষাও হীনতর পশুপক্ষ্যাদি দেহ প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

গীতা, ৯ম অঃ, ২৫ শ্লোক।

দেবতার উপাসক দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, পিতৃলোকের উপাসকেরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন, ভূতলোকের উপাসকেরা ভূতলোক প্রাপ্ত হয়েন, আর আমার (ঈশ্বরের) উপাসকেরা (তাঁহাদের সমান আমাসেই) আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। (১)

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, স্বর্গাদি সকল ফলই নশ্বর। শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন, দেবতারাও সৃষ্ট এবং নশ্বর। তাঁহারাও মনুষ্যের ন্যায় জন্ম, মৃত্যু ও সুখদুঃখের অধীন। তাঁহারাও ঈশ্বরোপাসনা করেন এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক শাসিত হয়েন। তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার বলেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

তস্মাচ্চদেবা বহুধা প্রসূতা সাধ্যা মনুষ্যা পশবো বয়াংসি।

২য় মুণ্ডক, ৭ শ্লোক।

সেই পরব্রহ্ম হইতে দেবতাগণ, সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ এবং পশুপক্ষীসকল জন্মিয়াছে।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কঠোপনিষদ্, ৬ষ্ঠ বল্লী, ৩ শ্লোক।

সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে অগ্নি তাপ দিতেছে, তাঁহারই

---

(১) উপরে কয়েকটী শ্লোকে জন্মান্তর পরিগ্রহ এবং যোনি-ভ্রমণের উল্লেখ আছে। যাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা এই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন যে, ঐ সকল উপাসকদিগের যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, তাবৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি না হইয়া দুর্গতি হইয়া থাকে। গ্রন্থকারও জন্মান্তর স্বীকারের কোন প্রয়োজন মনে করেন না।

ভয়েতে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, আর তাঁহারই ভয়েতে ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেহস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ শ্রুতি।

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্যস্থিত সম্ভজনীয় পরমাত্মাকে সমুদয় দেবতারা উপাসনা করিতেছেন।

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।

ইন্দ্রাদয়ঃ লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ॥

মহানির্ব্বাণ, ২য় উল্লাস, ৩৯, ৪১ শ্লোক।

সকলের কারণরূপা তাঁহা দ্বারাই আমরা (দেবতারা) সৃষ্ট হইয়াছি। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সকলেই তাঁহার অধীন।

এই সকল কথা প্রত্যেক হিন্দুই অবগত আছেন। অথচ যাঁহারা দেবতাদিগকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া বলেন, তাঁহারা নিতান্তই সত্যের অপলাপ করেন।

দেবতারাও যে মনুষ্যের ন্যায় সুখ দুঃখাদির অধীন, তাহা কে না জানে? কোন দেবতা অন্নাভাবে ভিক্ষা করিতেছেন, কেহ বা রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া জেতার সেবা করিতেছেন, কেহ বা কোন মনুষ্যের তপোবলদর্শনে হিংসাপ্রণোদিত হইয়া নানাবিধ কৌশল-জাল বিস্তার করত তাহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন, কেহবা অন্য দেবতার দৃষ্টিমাত্র মস্তকহীন হইয়া গজমুণ্ড ধারণ করিতেছেন, কেহবা অন্য দেবতার অভিশাপে ছাগমুণ্ড হইতেছেন; কেহবা বিবাহ করিতে না পারিয়া মনোদুঃখে যাবজ্জীবন কৌমার ব্রতাবলম্বন করিতেছেন;

কেহবা সুন্দরী অপ্সরা-রূপে মুগ্ধ হইয়া কামাবেগে স্খলিত অর্দ্ধচরণ করিতেছেন, কেহবা স্বীয় কন্যাতে গমন করিয়া কলঙ্কিত হইতেছেন, কেহবা গুরুপত্নী হরণ করিয়া গুরুর অভিশাপে সর্ব্বাঙ্গে যোনি প্রাপ্ত হইতেছেন, এ সকল কে না জানে? ইহা জানিয়াও তাঁহাদিগকে পরব্রহ্ম মনে করা কি একান্ত মূঢ়ের কার্য্য নহে? দেবতাদেরও যে অবস্থা, অবতারদেরও সেই অবস্থা। রাম, কৃষ্ণ, সকলেই শোকদুঃখ, সম্পদ বিপদে অভিভূত হইয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আবার ইঁহারাও ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা, অভ্যাস ও সাধন করিয়াছেন। এক্ষণ কথা এই যে, যাঁহারা স্বয়ং সকল বিষয়েই আমাদিগের ন্যায় সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও সম্পদ বিপদের অধীন, তাঁহাদিগের উপাসনা করিয়া জীব কিরূপে মুক্ত হইতে পারে? যাঁহারা স্বয়ং মোক্ষভিখারী, তাঁহাদের উপাসনাদ্বারা কিরূপে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভবে? শাস্ত্রকারেরাও এই জন্যে বলিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায।"

যদি বল, কোন কোন দেবতা আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের উপাসনা করিলে ব্রহ্মোপাসনা হয়, ইহার উত্তর এই যে, ঐ সকল দেবতাদের ন্যায় অনেক মনুষ্যও সেইরূপ বলিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানোৎপত্তি হইলে যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান হয়, তখন সকলেই এরূপ বলিতে পারে। পরমাত্মা জীবাত্মার প্রাণ-স্বরূপ। জ্ঞান, ধ্যান, ও প্রেমযোগে এই সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিলেই তাঁহাকে 'আমি' বলিয়া বলা যায়। কিন্তু জ্ঞানযোগে যুক্ত হইলেও যত-

ক্ষণই জীবের অস্তিত্ব আছে, ততক্ষণ সে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। ব্রহ্মযুক্ত হইলেই কেহ ব্রহ্ম হয় না। সুতরাং দেবতারাও ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পারেন না, এবং তাঁহাদের উপাসনায় ব্রহ্মোপাসনাও হয় না। বাম-দেবাদি ঋষিগণও আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। যথা—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দো রূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ স্মৃতি।

"আমি দেবতা, অন্য কেহ নহি ; আমি ব্রহ্মই, শোকবিহীন, সচ্চিদানন্দরূপ এবং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।" ভাগবতে কপিল মুনিও "আমি ব্রহ্ম, আমাকেই জান" এইরূপ উপদেশাদি করিয়াছেন। "যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু" "অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইত্যাদি শ্লোক তাঁহারই উক্তি। আর, বরাহাদি অবতারের ন্যায় তাঁহাকেও এক অবতার বলা হইয়াছে। (৩স্ক, ২১অ, দেখ।) কিন্তু তাই বলিয়া কেহই বামদেবাদিকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করে না। বেদান্ত-সূত্র এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ"। ১ম অ,১ম পা,৩০ সূত্র।

অর্থাৎ বামদেবের ন্যায় শাস্ত্র-দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারা 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ উপদেশ করা যায়। ঐ বেদান্ত-সূত্র-কর্ত্তা স্বয়ং যে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়াছেন এবং তাঁহার মুখে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ বলাইয়াছেন, তাহারও কারণ ইহাই অনুমান হয়।

পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে দেবতাদিগকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন, তাহা কেবল আপনাপন দেবতার উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য, এবং তাঁহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি-বশতঃ। নতুবা ঐ সকল দেবতা যদি ব্রহ্ম

হয়েন, তবে বহুব্রহ্ম প্রতিপন্ন হয়। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কালীমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রে কালীকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্রী বলা হইয়াছে, শিবমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক গ্রন্থে শিবকে অপরাপর দেবতার এবং বিষ্ণু-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রে বিষ্ণুকে অপরাপর দেবতার স্রষ্টা বলা হইয়াছে। আবার পরস্পর নিন্দাবাদও যথেষ্ট আছে। এ সকল কথার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শাক্ত বৈষ্ণবাদির বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধই আছে। যদি সেই সকল দেবতারা প্রত্যেকেই ব্রহ্ম হয়েন, তবে পরস্পর অধীনতা ও স্রষ্টাসৃষ্টত্ব সম্বন্ধ হয়, এবং ব্রহ্মে ব্রহ্মে বিরোধ হয়; এক শাস্ত্রদ্বারা অপর শাস্ত্র খণ্ডিত হইয়া সকল ধর্ম্মই লোপ পায়। এই বিপদ দেখিয়াই বুঝি বর্ত্তমান সময়ের একজন কৃষ্ণোপাসক বলিয়াছেন, "মহাভারত ও পুরাণ সকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ"। (১) যে কথায় আপন উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য খর্ব্ব হয়, তাহাকে "নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনা" বলিয়া দোহাই দিলে, কোন শাস্ত্রই টিকিবে না। সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রকে ঐ সকল দেবতার প্রশংসা-সূচক মনে না করিয়া প্রকৃত কথা মনে করা উচিত নহে। আমরাও দেখিতেছি, একজন সামান্য লোক, আপনা অপেক্ষা একজন সম্ভ্রান্ত লোককে 'হুজুর' 'মহারাজা' 'পিতা' 'প্রভু' 'ধর্ম্মাবতার' ইত্যাদি

---

(১) প্রচার, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭ পৃষ্ঠা। ঐ পৃষ্ঠায় আরও আছে, "এখন বুদ্ধিমান্ পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবী দাওয়া কিছুই নাই।"

বলিয়া থাকে, তাই বলিয়া কেহ, 'হুজুর' 'মহারাজা' ইত্যাদি হয় না, অথবা সেই লোককে প্রতারক বলিয়া শাস্তিও দেয় না। বেদান্ত-সূত্র ইহার মীমাংসায় বলেন,—

ব্রহ্ম-দৃষ্টি রুৎকর্ষাৎ॥ ৪অ, ১পা, ৬সূ।

অর্থাৎ ঐ সকল দেবতাদিগের প্রশংসার জন্যই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

যদি বল, দেবতা এবং অবতারদিগের এই সকল শোক দুঃখাদি লীলা মাত্র, বাস্তবিক তাঁহারা সুখ দুঃখের অধীন নহেন, ইহার উত্তর এই যে, তাহা হইলে জগতের সকল ব্যক্তিরই শোক দুঃখাদিকে লীলা বলিতে দোষ কি? আর শাস্ত্রেও বলেন, এ সকলি ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা মাত্র। আত্মার সুখ বা দুঃখ, জন্ম বা মৃত্যু, সকলি ঈশ্বরের লীলা। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয় বিস্তৃত বিবৃত আছে। এই গ্রন্থ অতি সুলভ, সকলেই দেখিতে পাবেন। ফলতঃ দেবতাদিগের শোক দুঃখাদিকে লীলা বলিয়া যদি তাঁহাদের উপাসনা করিতে হয়, তবে মনুষ্য ও দেবতা উভয়েরই পরস্পরকে উপাসনা করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতেও ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় না।

দেবতাগণ এবং ব্রহ্ম যে স্বতন্ত্র, তাহা অনেকে স্বীকারও করেন, তবে এই বলেন, যেমন রাজার নিকট কোন কারণে যাইতে হইলে, তাঁহার দ্বারী সভাসদ্ এবং মন্ত্রীগণকে অগ্রে তুষ্ট করিতে হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে পাইতে হইলে, অগ্রে দেবতাদিগকে তুষ্ট করিতে হয়। অন্তর্যামী, সর্ব্বদর্শী, ভক্তবৎসল, করুণাময় পরমেশ্বরকে না বুঝিতে পারিয়াই অজ্ঞানতাবশতঃ লোকেরা এই রূপ বলিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, পৃথিবীর সামান্য তু-

খণ্ডের মানুষ রাজার সঙ্গে বিশ্বরাজের তুলনা হয় না। পৃথিবীর রাজা যদি অন্তর্যামী হইতেন, তিনি যদি অমাত্যাদির সাহায্য ব্যতিরেকে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন, তবে কি তাঁহাকে দুঃখ জানাইবার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীর খোসামোদ করিতে হইত? যাহারা স্বয়ং কোন রাজা বা ধনী ব্যক্তির কর্ম্মচারী হইয়া, কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিব বলিয়া লোকের অর্থ শোষণ করে, এবং কেহ তাহাদের মনের মত অর্থ দিতে না পারিলে প্রভুর নিকট তাহার বিরুদ্ধে বলে, বা তাহার কার্য্যের প্রতি অমনোযোগ করে, অথবা যে সকল ব্যক্তি রাজা বা ধনীর দ্বারে গিয়া অর্থ ও তোষামোদদ্বারা কার্য্য সাধন করিয়া লয়, সেই সকল সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ভ্রান্ত লোকেরাই ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইরূপ বলে। ইহারা মানুষকে যেমন ঘুষ দিয়া কার্য্য উদ্ধার করে, তেমনি মন হইতে পাপ ও অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত না করিয়াই, দেবতাদিগকে ঘুষ দিয়াই যেন ব্রহ্মপদ লাভ করিতে চায়। প্রকৃত কথা এই যে, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে পারে, সেই ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে। আত্মা পবিত্র না হইলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় না, এবং পবিত্র হইলে কেহই আমাদিগকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম প্রাপ্তি-সম্বন্ধে আত্মাই আত্মার সহায় এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের চিন্তা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপদেশ গ্রহণাদিদ্বারা জ্ঞান প্রসন্ন হয়। সাধকদিগের জীবন চিন্তা ও আলোচনা করিলে, তাঁহাদিগের সহবাস করিলে, এই জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, এবং হৃদয়ের সদ্ভাব সকল জাগিয়া উঠিতে থাকে। যে একাগ্রচিত্তে যাহার চিন্তা করে, তাহার হৃদয়

তন্ময়ই হইয়া যায়, এবং প্রীতিপূর্ব্বক যাহার সহবাস করে, মন তাহারই মত হইয়া যায়। চিত্তকে শুদ্ধ করিতে হইলে সেই শুদ্ধ বুদ্ধ পরমেশ্বরেরই ধ্যান, চিন্তা, স্মরণ, কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি, এবং শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ ভগবৎপ্রেমিক সাধুগণের সহবাস প্রয়োজন। ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, আনুগত্য, এ সকল মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। মন প্রিয়ভাবে যাহার দিকে ধাবিত হয়, যাহার ধ্যানাদি করে, এ সকল বৃত্তিও আপনা হইতে তাহারই প্রতি ধাবিত হয়। মন যখনি আবার তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখনি ইহারাও প্রতিনিবৃত্ত হয়। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, স্বদেশ, ধন, মান, যশ, সুখ, ভোগ-বিলাস, অথবা দেবতা, বা ঈশ্বর,—মন যাহাকে প্রিয়ভাবে চিন্তা করে, তাহারই প্রতি ভক্তি জন্মে, বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে, প্রেম ঘনীভূত হয় এবং তাহারই সেবা করিতে সহজে প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে প্রিয়জ্ঞান করে। সুতরাং সর্ব্বদাই তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করা উচিত। এবং যাহাতে লোক সকল অজ্ঞানতা-বশত অসার ইন্দ্রিয়-সুখে মুগ্ধ না হইয়া প্রকৃত অবলম্বনীয় পথ বুঝিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা প্রধান কর্ত্তব্য।

উপরে যে বিষয়ের আলোচনা করা গেল, তাহা অনুধাবন করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, চিত্তশুদ্ধির জন্যও দেবতা দিগের উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কার্য্যতও দেবতাদিগের উপাসনাদ্বারা লোকের চিত্তশুদ্ধির দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। প্রত্যুত, দেবতারা মানুষের পার্থিব সুখ সম্পদ দিতে পারেন, ইন্দ্রিয়-সুখের উপকরণ সকল উত্তম রূপে যোগাইতে

পারেন, এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত লোকেরা দেবতার উপাসক হইয়া, সচ্ছন্দে মনপ্রাণ প্রলোভনের স্রোতে ঢালিয়া দিয়া সংসারেরই সেবা করিতেছে, দেবতার নামে সুরাপান, ব্যভিচার, নরহত্যা, সকলি করিতেছ, অসংখ্য পাপাচরণ করিয়া ধন সংগ্রহ করতঃ নানা উপচারে আড়ম্বরে দেবতার পূজা করিয়াই পরম ধার্ম্মিক বলিয়া অভিহিত হইতেছে। কোথাও সিদ্ধি লাভ করিবার আশায় নরবলি দিতেছে, কোথাও সতী নারীর সতীত্ব বলি দিতেছে, কোথাও আপন উপাস্য দেবতার লীলার অনুকরণ করিতে গিয়া শিষ্যপত্নী ও শিষ্যকন্যাগণের সহিত লীলাবিহার করিতেছে, আবার তাহারাই পরমভক্ত বলিয়া পরিচিত হইতেছে। ফলতঃ যাহার মূলে অজ্ঞানতারূপ মহাবিষ, তাহার ফলে অমৃত-লাভ কিরূপে হইবে? তবুও, যেমন বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে এক এক বার জ্ঞানসঞ্চার হইয়া মনে পড়ে যে,এ সকল স্বপ্ন মাত্র, সেইরূপ এই সকল অসার, ভোগৈশ্বর্য্যে মুগ্ধকারী, ব্রহ্মবিষয়ে চিত্তের সমাধিনাশক অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়িয়াও সময়ে সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মের বলেই লোকের চেতনা হইতে দেখা যায়, তাই সময়ে সময়ে লোকের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। পৌত্তলিক তখন চিরকালের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, বহুকালের পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী যেমন মুক্ত হইলেও ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় পিঞ্জরে প্রবেশ করে,—স্বাভাবিক স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিতে পাইয়াও বঞ্চিত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র ভাবের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন। তখন আপন আপন ক্ষুদ্র দেবদেবীতেই ঈশ্বরের স্বরূপের আরোপ করিতে থাকেন। এই জন্যই রামপ্রসাদ কালীকে

সাকারা, শিবপত্নী, গিরিরাজার কন্যা জানিয়াও, মনের ঈশ্বর-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাকেই বলিয়াছেন,"শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা", "দ্বিজ রামপ্রসাদ রটে মা বিবাজেন সর্ব্বঘটে"; "কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে তার কি প্রসঙ্গ", "দেবের দেব মহাদেব যাঁহার চরণে লোটায়", "কাজ কি আমার কাশী", "ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কায কিরে তোর সে গঠনে", "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জাননা"; "কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায় আলোচা'ল আব বুট ভিজানা", "কেমনে দিতে চাস্ বলি মেষ মহিষ আর ছাগলছানা"। আত্মার সঙ্গে ঈশ্বর গাঁথা ; যাহার আত্মদৃষ্টি হয়, তাহার কিছু না কিছু ব্রহ্মজ্ঞান অবশ্যই হয়। এই জন্যই সকল প্রকার লোকের মধ্যেই সময় সময় এমন এক এক জন লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা চতুর্দ্দিকস্থ গাঢ় অজ্ঞানতা ও কুসংস্কাররূপ অন্ধকারের ভিতর আগ্নেয় গিরির স্থায় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া থাকেন।

অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে, সাকার-সাধন করিতে করিতেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। বাস্তবিক ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর কথা। জ্ঞান-সাধন ব্যতিরেকে জ্ঞান জন্মে না। কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান হয় না। সাকার-সাধন করিতে করিতে যাঁহারা কোনও প্রকারে তৎসঙ্গে জ্ঞানের আলোচনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তাহাতে সাকার-সাধনার কোন বাহাদুরী নাই। পরন্তু তাঁহাদিগেরও মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকাতে বহুলরূপে ব্রহ্ম-সমাধির পক্ষে অন্তরায় হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানসাধনা একবারেই পরিত্যাগ করিয়া সাকার-সাধনা করিতে থাকিবেন, কোটী কোটী বৎ-

সরেও তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না। তাহার প্রমাণ শাস্ত্র হইতেও পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সাকার উপাসনা বাস্তবিক ব্রহ্মোপাসনাও নহে, ব্রহ্মোপাসনার সাধন বা সোপানও নহে। কামনার পদার্থসকল লাভ করাই সাকার উপাসনার মূল মন্ত্র। ইহলোকে পরলোকে নানাপ্রকার সুখলাভের আশাতেই লোকেরা সাকার উপাসনা করিয়া থাকে। সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইবে, রোগ শোক নষ্ট হইবে, রাজত্ব ও ধন-লাভ হইবে, উত্তম স্বামী, স্ত্রী, বা পুত্র কন্যা প্রাপ্ত হইবে, উত্তম দাসদাসী পাইবে, আবার পরকালেও এই সকল সুখ-সম্বলিত স্বর্গ-ভোগ লাভ হইবে, ইহাই সাকার উপাসনার মূলে রহিয়াছে। সাকার দেব দেবী প্রসন্ন হইলে এইসকল সুখ হয়, অপ্রসন্ন হইলে এতদনুরূপ দুঃখসকল প্রদান করেন—এই বিশ্বাসেই লোকেরা সাকার উপাসনা করিতেছে। চতুর লোকেরা এই সকল সুযোগ দেখিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন দেবতা আবিষ্কার করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছে। এই সূত্রে কত ঠাকুর, কত ফকীর, কত পীর, কত মন্দির বা মস্‌জিদ, কত বৃক্ষ, কত স্তম্ভ, কত প্রাচীন দীঘি পুষ্করিণী, কত পশু মানুষের পূজা গ্রহণ করিতেছে। একদিকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার, অপর দিকে সাংসারিক সুখের আশা, এই দুয়ের ঘোর তাড়নায় মানুষ কি করিতেছে কি না করিতেছে। যদি একবার সরল ভাবে চিন্তা করেন, তবে সকলেই বুঝিবেন যে, যদি এই দুটী কারণ না থাকিত, তবে প্রায় কেহই দেব দেবীর পূজা করিত না।

দেব দেবীর উপাসনা যে কেবল অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারের

ফল, তাহার আরও প্রমাণ আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিকতর অজ্ঞ। তাহাদের পূজা, অর্চনা, ব্রত কতই আছে, যাহা দেখিলে অনেক সময় পুরুষগণ হাস্য করিয়া থাকেন। আবার যতই নিম্নশ্রেণীর লোকের দিকে দৃষ্টি করা যায়, ততই দেবতার সংখ্যা অধিকতর দেখা যায়। ঢাকায় বুড়ীগঙ্গা হইতে যে কামান পাওয়া গিয়াছিল, কত শত লোক তাহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতেছে। তাহাকে প্রতিদিন তৈল, সিন্দুর, পুষ্প এবং অন্যান্য মানসিক দ্রব্য প্রদান করিয়া কেহ বা সন্তান, কেহ বা আরোগ্য, কেহ বা ধন ধান্য প্রার্থনা করিতেছে। ইহা দেখিয়া কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি না হাসেন? নিম্নশ্রেণীর বালিকা এবং স্ত্রীলোকেরা নানারূপ দেবতার ব্রতোপাসনা করিয়া, কেহ বা সতীনের মস্তক চূর্ণ করিতে, কেহ বা সতীনকে জলে নিমগ্ন করিয়া মারিতে, কেহ বা তাহাকে স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা,ও নিজের দাসী করিয়া রাখিতে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। এইরূপ প্রতিদিন কালুবায়, ওলাবিবি, মাণিকপীর, ঘণ্টাকর্ণ, বড়াম প্রভৃতি কত দেবতার পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে কয়জন ইহা করিয়া থাকেন? কত লোক এই সকল ব্যাপারকে মূর্খদের কার্য্য বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। সেই রূপ যাঁহারা ঈশ্বর-প্রেমের রসাস্বাদন করিয়াছেন, যাঁহারা আপনার হৃদয়েই তাঁহার সহবাসলাভ করিয়া, তাঁহাকে হৃদয় মনের সহিত সেবা করিয়া, তাঁহার প্রীত্যর্থে আত্মদান করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, তাঁহারাও এই সমস্ত মূর্ত্তি-পূজা, চাল কলার নৈবেদ্য, ছাগাদি বলি, এবং "ধনং দেহি জনং দেহি" "সুরূপাং

বনিতাং দেহি" প্রভৃতি প্রার্থনা করিতে দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন, "যেমন বালকেরা ধূলা লইয়া রাঁধাবাড়া করিয়া রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম শিখিয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ প্রতিমাদি পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মোপাসনা শিখিতে পারিব।" এইরূপ তর্কদ্বারা তাঁহারা প্রতিমা-পূজার সমর্থন করিতে গিয়া ফলে তাহারই সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন। তাঁহাদের এই কথায় ইহাই প্রমাণিত হয়, যেমন ধুলার রান্না প্রকৃত রান্না নহে, ধূলার পরমান্ন আহার্য্য হইতে পারে না এবং তদ্দ্বারা ক্ষুধা নষ্ট বা শরীর-রক্ষা হইতে পারে না, সেইরূপ প্রতিমাদির পূজাও প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নহে, এবং সে পূজাদ্বারা আত্মার মুক্তিও হইতে পারে না। এই অভ্যাসাদির দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা-শিক্ষাও হইতে পারে না। বালিকারা ধূলা রান্ধিয়া রান্না শিখিয়া থাকে, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বাস্তবিক অতি অল্প বিবেচনা করেন। কেননা তাহারা যদি বাড়ীতে প্রতিদিন রান্না করিতে না দেখিতে পায়, তবে কখনি তাহাদের ধূলা রান্ধা সম্ভব হইতে পারে না। তাহারা দেখিয়া থাকে যে, অগ্রে উনন জ্বালিয়া হাড়ীতে জল এবং ডাল তুলিয়া দেওয়া হয়, কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধ হইলে তাহা ঘুটিয়া লবণাদি দেয়, তদনন্তর সম্ভার প্রদান করে। তদনুসারে তাহারাও তাহাদের মাটীর ডাল রান্ধিয়া থাকে। বাড়ীর রান্না না দেখিলে মাটীর ডালও তাহারা রাঁধিতে পারে না। আর মাটীর রান্না শিখিয়া কি পরিমাণ জিনিষে কত জল মসলা এবং জ্বাল দিতে হয়, তাহার কি প্রকার রস হওয়া উচিত, তাহা কখনো শিখিতে

পারে না। প্রকৃত রান্না না দেখিলে, বা নিজে রান্না না করিলে কখনো সে জ্ঞান হয় না। তাহারা বাড়ীতে রান্না দেখিয়া যাহা শিখিয়া থাকে, সঙ্গিনী লইয়া আমোদের জন্য তাহারই অনুকরণ করে মাত্র। তাহার কোন ফল হয় না, প্রভুত তাহাও দুদিনের জন্য। সেইরূপ ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা না করিয়া পুতুল-পূজা শিক্ষা করিলে, তদ্বারা কোনই উপকার হয় না। পুনশ্চ, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ব্রহ্মোপাসনা ও পুতুল-পূজা দুটী স্বতন্ত্র জিনিষ। দুই এর মূল স্বতন্ত্র, ফলও স্বতন্ত্র, কার্য্যও স্বতন্ত্র। সুতরাং একের অনুকরণ অন্যটীকে বলা যায় না। আর অনুকরণ হইলেও কোন লাভ নাই। যেমন প্রকৃত রান্নার অনুকরণে ধুলার রান্না, কিন্তু তাহাতে ক্ষণিক আমোদ ব্যতীত প্রকৃত রান্নার ফল হয় না, তেমনি অনুকরণের পূজায় প্রকৃত পূজার ফললাভ হয় না। আবার, এই পুতুল-পূজা যদি বালিকার ধুলাখেলাই হইল, তবে বালিকার ধুলাখেলার মত কেন শাস্ত্র শীঘ্র ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত উপাসনা গ্রহণ করিতে পার না? লক্ষ লক্ষ লোক চির জীবনই বালিকা হইয়া ধুলা-খেলা করে, একদিনও প্রকৃত কার্য্য শিখিতে পারে না, এ বড় অন্যায় কথা।• এমন 'বুড়ো খুকী' হওয়াটা কি বড় সুখের বিষয়? তবে খুকীর মত জ্ঞান শিক্ষা করিলেই তো শীঘ্র মানুষ হইতে পারা যায়। জ্ঞানের কথা বলিতে গেলে বৃদ্ধ সাজিয়া বড়-বড় তর্ক করিতে বসিবে, অথচ খুকি হইয়া ধুলি রাঙ্গিবে, এবড় দুঃখের বিষয়। ধুলা রান্ধার আমোদ না ছাড়িলে গৃহিণী হওয়া যায়না।

আবার কেহ কেহ বলেন, "প্রতিমা বাস্তবিক ঈশ্বর নহেন, তাহা ঠিক। কিন্তু নিরাকারের ধ্যান করিতে পারি না, বিশেষত

মন অতি চঞ্চল; নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা করিতে গেলেই আরও চঞ্চল হইয়া পড়ে; সুতরাং মনস্থির করিবার জন্য প্রতিমা পূজা করি এবং ঐ সকল রূপের ধ্যান করি।" কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে, ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থের ধ্যানদ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের ধ্যান সম্ভব হয় না। বিশেষত যতই ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ে মানুষ মনোযোগ দিবে, ততই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের ধ্যানের ক্ষমতা তাহার হ্রাস হইয়া যাইবে। অদৃশ্য ঈশ্বরের চিন্তা অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে ধ্যান গাঢ়তর হইবে। নতুবা রূপের ধ্যান করিতে করিতে এই হয় যে, রূপ না পাইলে ধ্যান করিতে পারা যায় না। তাহার দৃষ্টান্ত হাতে হাতে দেখা যাইতেছে যে,প্রতিমার উপাসকেরা নিরাকারের ধ্যান অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন। যে যেটী শিক্ষা না করে,তাহার কাছে সেটী অসম্ভবই বোধ হয়। পৃথিবীতে কোটী কোটী লোক তো ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াই স্বীকার করিতেছে এবং সেই রূপেই উপাসনা করিতেছে। তাহারা তো কখনো বলেনা,"রূপ না হইলে ধ্যান অসম্ভব।" না পড়িয়াই 'পণ্ডিত হইতে চাহিলে চলিবে কেন? রূপের ধ্যান ছাড়, শিক্ষা কর, অভ্যাস কর, সাধনা কর, নিরাকারের ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে। নিরাকারের ধ্যান কয় দিন করিবে? —যে কটাদিন চক্ষু দুটা আছে। তারপর কি হইবে?—রূপের মায়ায় তো যম ছাড়িবে না। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন, তাঁহাদের শাস্ত্র ধরিলে,রূপের টানে,—সাকারের টানে,পুনরায় ভবযন্ত্রণা; যাঁহারা সে শাস্ত্র না মানেন, তাঁহাদেরও আত্মার বিষম দুর্গতি হইবে।

আরও দেখাযায়, সাকার-পূজায় বাহ্যিক আড়ম্বর, আয়োজন,

ব্যস্ততা এবং আমোদ অতিশয় বেশী। দুর্গোৎসব, নন্দোৎসব, দোলের হুলি, চড়ক প্রভৃতি উৎসবে আমোদ এত বেশী যে, আমোদপ্রিয় লোকেরাই ইহাতে বেশী মত্ত হয়। তাহারা কেবল এই সকল উৎসব খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহাতে তাহাদের চঞ্চল মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠে। এই আমোদটুকু রহিত করিলে কয় জন লোক সুখী হইবে ? সরল পাঠক বেশ বুঝিবেন, তাহা হইলে অনেক ব্যক্তির মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কত আমোদ-প্রিয়, সৌখীন, নিষ্কর্ম্মা, গল্পপটু ও ক্রীড়াদক্ষ ইয়ারবাবু, কত মণিহারীদোকানদার,—বলিতে কি, চারিদিকে যেরূপ দেখিতেছি, কোথাও বা কত মদ্যবিক্রেতা ও কত বারাঙ্গনার মুখ শুকাইয়া যাইবে। পাঠক মহাশয় একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি ইহারা কি ধ্যান করিতে শিক্ষা করিতেছে। ইহাদের মন দিন দিন কি চঞ্চলই হইবে না ?

কাহারও কাহারও মুখে এরূপও শোনা যায় যে, দেবতাদিগের পূজাদ্বারা অনেক সময় অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা নিতান্ত অন্যায় কথা। এই প্রলোভনে পড়িয়াই দস্যুরা কালীর পূজা করিয়া থাকে। কালী তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া নরবলি প্রদান করে। এই প্রলোভনেই অনেকে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া দেবদেবীর চরণে নানা প্রকার মানসিক করিয়া থাকে। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই অতিশয় ভক্তি-ভরে দেবতার পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু দুইজনের অভীষ্ট কখনই সিদ্ধ হয়না।

কাহারও পুত্রের সঙ্কটাপন্ন পীড়া উপস্থিত। অমনি দৈবজ্ঞ আসিয়া বলিলেন, "স্বস্ত্যয়ন কর, ভাল হইবে।" পিতা আশায় পড়িয়া দৈবজ্ঞ যাহা চাহিলেন তাহাই দিলেন। যদি পীড়া

ভাল হইল, দৈবজ্ঞের বাহাদুরীর সীমা নাই। যদি ভাল না হইল, দৈবজ্ঞ অমনি বলিয়া বসিলেন, "কর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়াছে, অথবা পুত্রের পূর্ব্বজন্মের অমুক পাপ ছিল; পরকালে মঙ্গল হইবে।" সুতরাং এ অভীষ্ট-সিদ্ধির মর্ম্ম বুঝা ভার। এত পূজা-করিয়াও ঠাকুরের মন পাওয়া গেল না, পরন্তু অঙ্গহানির পাপে পুনরায় ঘোর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কোন গৃহস্থের যদি পাঁঠা এক আঘাতে দ্বিখণ্ড না হইয়া থাকে, গৃহস্থ ঠাকুরের কোপে পড়িলেন। ঠাকুর কখন কোন্ পুত্রটীর প্রাণ নাশ করিবেন, এই ভয়ে সকলে অস্থির। হায়, অজ্ঞানতার কি বিষময় ফল।

প্রথমতঃ, দেবোপাসকগণ, কোন্ দেবতাকে ছাড়িয়া কোন দেবতার উপাসনা করিবেন, কোন্ দেবতা কখন পূজা না পাইয়া কুপিত হইবেন, এই ভয়ে সর্ব্বদা শশব্যস্ত, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া হাবুডুবু খান। দ্বিতীয়তঃ, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া পূজা আরম্ভ করিলেও, দুর্ভাগ্য-বশত দৈবাৎ যদি কোন প্রকার ত্রুটী হয়, তাহাতেও বিপদ্। একটু কল্পিত অভীষ্টের আশায় পড়িয়া নানা প্রকার দুর্দ্দশা। কিন্তু যিনি ভক্তি-সহকারে একনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাহার এ সকল বিপদ ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এবং ভক্তবৎসল। তাঁহার ভক্ত দুর্ব্বল হইলেও তিনি তাঁহাকে স্বীয় অভয় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করেন।

> ন চাস্ত প্রত্যবাযোঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যমেবচ।
> মহামনোঃ সাধনে তু ব্যঙ্গং সাঙ্গায়তে ধ্রুবম্॥
> কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহা রুষ্টা বেতালা শ্চেটকাদয়ঃ।

পিশাচা গুহ্যকা ভূতা ডাকিন্যো মাতৃকাদয়ঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে পরাঙ্মুখাঃ॥

মহানির্ব্বাণ, ৩য় উল্লাস, ১২১, ২৫ শ্লোক।

তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥
তরোর্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্য স্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে॥

মহানির্ব্বাণ, ২য় উল্লাস, ৪৭, ৪৮, ৫২, শ্লোক।

অর্থঃ—"এই ব্রহ্মমন্ত্র সাধনে কোন প্রকার প্রত্যবায় বা অঙ্গবৈগুণ্য নাই। এই মহামন্ত্রের সাধন অঙ্গহীন হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের ন্যায় কার্য্য করে, ইহা নিশ্চয়।"

"গ্রহগণ, বেতালগণ, চেটকগণ, পিশাচগণ, ভূত ও গুহ্যকগণ অথবা ডাকিনী ও মাতৃকাগণ প্রভৃতি রুষ্ট হইয়া তাহার (ব্রহ্মোপাসকের) কি করিবে? তাহার দর্শনমাত্রেই সকলে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে।"

"হে দেবি, তাঁহার (পরব্রহ্মের) আরাধনায় সকলেরই সন্তুষ্টি সাধিত হয়। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলেই তাহার ভুজপল্লব পুষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের আরাধনাতেই সকল অমরগণ তৃপ্ত হয়েন।"

"প্রিয়ে, আর অধিক বলিলে কি হইবে? তোমাকে এই বলিতেছি, তিনি বিনা ধ্যেয়, পূজ্য, সুখারাধ্য, এবং মুক্তির উপায় আর কেহই নাই।"

সর্ব্বে দেবা অস্মৈ বলিমাহবন্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদ।

সকল দেবগণ ব্রহ্মোপাসকের পূজা করিয়া থাকেন।

পুনশ্চ, "পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥"

গীতা, ৬অ, ৪০ শ্লোক।

হে পার্থ, ব্রহ্মযোগ-ভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহকালে বা পরকালে কখনি নষ্ট হয় না। হে তাত। কল্যাণকারী ব্যক্তির কখনো দুর্গতি হয় না।

এই সকল শ্রেষ্ঠ পথের শ্রেষ্ঠ ফল অজ্ঞাত থাকাতেই অনেক ব্যক্তি ভ্রমে ও প্রতারণায় পতিত হয়েন। আবার এমনও অনেক আছেন, যাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও সংসারের মোহে পড়িয়া কুপথে পদার্পণ করেন। শাস্ত্রাদির আলোচনা, এবং ব্রহ্ম-বিষয়ে জানিবার আকাঙ্ক্ষা না থাকাতেই এত দুর্গতি হইয়াছে।

যে ফল-লাভের আশায় দেবতাদিগের উপাসনা করা যায়, তাহা বাস্তবিক ঈশ্বরই প্রদান করেন। মানুষ মূঢ়তা-বশতঃ মনে করে, দেবতারাই এই ফলবিধান করিতেছেন। তাহার ফল এই হয় যে, তাহারা সেই সকল দেবতাদিগকেই ফলদানের কর্ত্তা মনে করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি অচলা ভক্তি স্থাপন করে, এবং পরকালে ঐ সকল দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদিগকে পুনরায় পতিত হইতে হয়। কেননা, যে ক্ষুদ্রকে অবলম্বন করে, তাহাকে রক্ষা কে করিবে?

যো যো যান্ যান্ যজেদ্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্যদাপ্তয়ে।
তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষ স্তৈস্তৈর্দ্দেবগণৈঃ শিবে॥

মহানির্ব্বাণ, ২য় উল্লাস, ৫১ শ্লোক।

যে ব্যক্তি যে কামনায় যে দেবতার উপাসনা করে, সেই অধ্যক্ষ-স্বরূপ পরমেশ্বর সেই দেবতাদ্বারা তাহাকে সেই ফল বিধান করেন।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তমেব বিদধাম্যহং॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেবযজোযান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

গীতা, ৭ম অ, ২১, ২২, ২৩, শ্লোক।

যে ব্যক্তি ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে দেবতার অর্চ্চনা করে, আমিই সেই দেবতাতে তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সে সেই শ্রদ্ধাদ্বারা সেই দেবতার আরাধনা করে, এবং তাহা হইতে ফললাভও করে। আমিই সেই ফল বিধান করিয়া থাকি। কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি মূঢ়দিগের ফল নশ্বর হয়। সেই দেব যাজকেরা সেই নশ্বর দেবতাকেই পায়, কিন্তু আমার (ঈশ্বরের) ভক্তেরা (সেই সকল ফলতো পায়ই, অধিকন্তু) আমাকেও (ঈশ্বরকে) পায়।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এক ঈশ্বরে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া থাকিলেই সকল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে অনেক লোক দেবতাদের উপাসনা না করিয়াও দেবোপাসকদিগের অপেক্ষা অধিকতর ধনধান্যাদি লাভ করিতেছে। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দেবতাদিগকেই ধনধান্যাদির প্রদাতা বলিয়া মনে করে, তাহারা, কখনি একনিষ্ঠ হইতে পারে না। তাহাদিগের

মন সর্ব্বদাই ভয়ে ব্যাকুল থাকে। এই ফললাভের আশায়, এবং দেবতাদের কোপ এড়াইবার জন্য, কত ভূত, প্রেত, ডাকিনীর উপাসনা করিয়া আত্মার দুর্গতি-সাধন করে। তাহাদের মন এই প্রকারে সর্ব্বদাই আন্দোলিত হওয়াতে ঈশ্বরে একনিষ্ঠা ভক্তি পায় না।

বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধিয়োহব্যবসায়িনাং।

গীতা, ২য় অ, ৪১ শ্লোক।

ঈশ্বরারাধনাহীন অবিবেকী দিগের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখা-বিশিষ্ট হয়।

সাকার উপাসনার অনুকূলে আর এক যুক্তি এই যে, পিতা-পিতামহাদি পুরুষানুক্রমে যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায়, অনেকের পিতা-পিতামহাদি কোন পুরুষে দুর্গোৎসবাদি করেন নাই, তাঁহারা সম্পন্ন হইয়া ঐ সকল ক্রিয়া করিতেছেন। জগদ্ধাত্রী, বটষষ্ঠী প্রভৃতি পূজা অতি অল্পকাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, অনেকেই জানেন, সুতরাং তাহাও হয়ত অনেকের প্রপিতামহ পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই। তবে তাঁহারা এ সকল অনুষ্ঠান কেন করেন? চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি অল্প কালের, কিন্তু কত শাক্ত তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কৌলীন্য-প্রথাও কয়েক শতাব্দী হইতে বল্লাল সেন সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল কেন লোকে গ্রহণ করিল? আবার এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের পিতা-পিতামহ চুরী ডাকাতি, অথবা অপরের দাসত্ব করিত। তাঁহারা কেন ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করেন? ইহার উত্তরে বলিবেন, উত্তম কর্ম্ম পিতাপিতামহক্রমে চলিত না থাকিলেও তাহা

গ্রহণ, ও অসৎ কর্ম্ম চিরকাল চলিত থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাও তো সাকার উপাসনা অপেক্ষা উত্তম। আমাদের উপনিষদাদি প্রধান প্রধান শাস্ত্রও তাহা উত্তম বলিয়া বলিতেছেন, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাসাদি ঋষিগণও তাহাই করিতেন, তবে কিছুদিন যাবৎ উহার অপ্রচলন হইয়াছে বলিয়া কি উহা অধম হইয়া গিয়াছে? এই যে যবনের নিকট অধ্যয়ন, বা যবনকে অধ্যাপন, ইহা কাহার কয় পুরুষ করিয়াছেন? ম্লেচ্ছের প্রস্তুত অন্নদ্বারা আঁটা চিঠী কাহার পূর্ব্ব পুরুষ মুখে তুলিত? এই যে কাগজ, যাহা না হইলে একদিন চলেনা, ইহার মধ্যেও ম্লেচ্ছান্ন আছে। জুতা সকলেই পরে, কিন্তু বর বর জন জুতা ছাড়িয়া স্নান করত আহার করিয়া থাকে? এ সকল কোন্ পূর্ব্ব পুরুষের কার্য্য? এতদ্ব্যতীত আরও কতশত কার্য্যে পূর্ব্ব পুরুষের রীতি উল্লঙ্ঘন করা হইতেছে। কলিকাতার কলের জল সহস্র সহস্র হিন্দুসন্তান পান করিয়া থাকেন। তাহাতে কি জাতিপাত হয় না? রেলগাড়ী এবং ষ্টিমারে শত শত হিন্দুসন্তান ম্লেচ্ছের সঙ্গে বসিয়া সচ্ছন্দে আহার করিতেছেন। গোলাপজল, অডিকলম, প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-প্রস্তুত জল অনেকে পানও করিতেছেন। শুণ্ডিকালয়ে যবনাদি সকল জাতির সঙ্গে মদ্যপান হাজার হাজার লোকে করিতেছে; বারাঙ্গনার জল শত শত লোকে পান করিতেছে, বিলাতি বিস্কুট প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রকাশ্যে গৃহে রাখিয়া অনেক হিন্দুসন্তান আহার করিতেছেন। তাঁহারাই আবার ব্রহ্মোপাসনার কথা শুনিলে পিতাপিতামহের দোহাই দিয়া বসেন। হিন্দুর দুর্গোৎসবে উইলসনের বাড়ীর খানা আনিয়া সাহেব খাওয়ান কাহার

কোন্ পুরুষে ছিল? পূর্ব্বোক্ত গর্হিত কার্য্যসকল পরস্পর জানাজানি করিয়াও কেহ অহিন্দু হয় না। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার নাম শুনিলেই হিন্দুসন্তান প্রমাদ গণিয়া বসেন। ফল কথা এই, যদি ব্রহ্মোপাসনাতে পার্থিব লাভ বা ইন্দ্রিয়ের বিলাস-সাধনের উপকরণ থাকিত, তাহা হইলে আর কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিত না। সত্য ও ন্যায়পর বিজ্ঞজনগণ-সমীপে এই প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া একবার চিন্তা করেন। সামান্য একটী জিনিষ কিনিতে হইলে আমরা দশবার আগুপাছু চিন্তা করি, কিন্তু, ঐহিক পারত্রিকের এক মাত্র সম্বল ঈশ্বরোপাসনাবিষয়ে ব্যাকুলভাবে চিন্তা না করা কি চতুরের কার্য্য? কোন প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে বলিয়াই তাহা উত্তম বলা যায় না। মিথ্যাপ্রবঞ্চনা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন কি আছে? চিরকালই বহুসংখ্যক লোক মিথ্যাদিকে উত্তম মনে করিয়া, তাহাদ্বারা কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা ধর্ম্ম হইতে পারে? ব্রহ্মোপাসনা কয়েক শতাব্দী হইতে সাধারণের মধ্যে অপ্রচলিত আছে বলিয়াই কি উহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে? সত্য প্রাচীন হউক আর নূতন হউক, তাহা অবলম্বনীয়। মিথ্যা প্রাচীন হইলেও পরিত্যাজ্য। পূর্ব্ব পুরুষগণ শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। স্বার্থপর লোকেরা উপনিষদাদি শাস্ত্রসকল হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া উত্তম পথ হইতে দূরে রাখিয়াছিল। তাঁহাদের ধর্ম্ম-পিপাসু অন্তঃকরণে নানা প্রকার প্রলোভন-জনক ক্রিয়াকর্ম্মাদিদ্বারা যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের কোন অপরাধ হইতে পারেনা।

কিন্তু যাহারা জানিয়া শুনিয়া নানা প্রকার ছলনাপূর্ব্বক সত্য পথ পরিত্যাগ করে, এবং যাহারা মূর্খ লোকদিগের মনোরঞ্জন-কারী কথাসকল বলিয়া তাহাদিগের হিতসাধন-চ্ছলে অহিতাচরণ করে, ঈশ্বরের নিকট তাহাদের বিশেষ শাস্তি আছে।

অনেকে বলেন, "ভাল, সাকার উপাসনা না হয় মিথ্যাই হইল, কিন্তু আমরা তো কিছু জানিনা, গুরু যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে।" কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, যখন আপন আপন পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া যায়, তখন সকলেই শিক্ষকের বিদ্যাবুদ্ধির অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যে বিদ্যালয়ে বিদ্বান্ ও শিক্ষা-প্রদানে সুদক্ষ শিক্ষক নাই, সেখানে কেহ পুত্রকে পাঠান না। এই যে পরা বিদ্যা, যাহাদ্বারা সেই পরম পুরুষকে জানা যাইবে, যাহাদ্বারা আত্মা আলোকিত হইবে, যে বিদ্যা-প্রভাবে মানুষের ত্রিতাপ নষ্ট হইবে, এমন বিদ্যা লাভ করিবার সময় কি গুরুর যোগ্যতা চিন্তা করা উচিত হয় না? গুরুর প্রনামে সকলেই বলিয়া থাকেন,

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
নেত্রমুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থাৎ যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকাদ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তির জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি। যিনি সেই অখণ্ডমণ্ডলব্যাপী পরম পুরুষের পরমপদ দেখাইয়া দেন, তিনিই গুরু। কিন্তু আমাদের দেশে কি এই রূপ লোক দেখিয়া গুরু করা হইয়া থাকে? গুরুদেব স্বয়ংই যাহা উপদেশ করেন, —যে মন্ত্র শিষ্যের কর্ণে প্রদান করেন, তাহার অর্থ বোঝেন না। অনেক সময়ে দেখিতে পাই,

গুরু অপেক্ষা শিষ্যই অধিকতর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক। সুতরাং এরূপ গুরুর উপদেশে কি জ্ঞান হইতে পারে? যিনি স্বয়ং গাঢ় অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন, যিনি স্বয়ং সে পদের কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না, তিনি কি প্রকারে অন্যের চক্ষুরুন্মীলন করিবেন? এবং কি প্রকারেই বা অন্যকে সেই পদ দেখাইবেন? মহাদেব উত্তমই বলিয়াছেন,—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপনাশকঃ॥

অর্থাৎ শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু বিস্তর আছেন, কিন্তু শিষ্যের পাপসন্তাপনাশক গুরু অতি দুর্লভ। শাস্ত্রে আছে, —

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রং ন সিদ্ধ্যতি॥

মহানির্ব্বাণ, ৩য় উল্লাস, ৩১ শ্লোক।

যে সাধক মন্ত্রের অর্থ এবং চৈতন্য অবগত নহেন, তিনি শত লক্ষবার মন্ত্র জপ করিলেও তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয় না। কিন্তু হায়, শত শত গুরুও মন্ত্রার্থ অবগত নহেন, যাঁহারা আবার অর্থ বুঝেন, তাঁহারা তাহার চৈতন্য অবগত নহেন। এক্ষণে সরল-হৃদয় পাঠক বিবেচনা করুন—প্রকৃত গুরু কে?

কেহ কেহ বলেন, "চিত্তশুদ্ধি না হইলে ঈশ্বরোপাসনায় অধিকার হয় না, সুতরাং আমরা কিরূপে তাঁহার উপাসনা করিব?" একথা কেহই অস্বীকার করেন না। আর যাঁহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, সাকারো-পাসকেরাও এ বিধির অধীন।

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতী।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥

তন্ত্রসার, দীক্ষা-প্রকরণ।

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী, সর্ব্বদা শুচি, শ্রদ্ধাযুক্ত, ধারণা-ক্ষম, শক্তিমান্, আচারাদিগুণযুক্ত কুলীন, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র ও সংযত-চিত্ত হয়েন, সেই ব্যক্তি শিষ্য হইবার উপযুক্ত, ইহার অন্যথা নাই। কিন্তু এই সকল গুণ দেখিয়া কয়জন গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া থাকেন? কথিত আছে,—

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রানি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥

মহাভারত

পরের সর্ষপতুল্য ছিদ্রও দেখা যায়, কিন্তু আপনার বিল্বতুল্য ছিদ্রও দেখা যায় না। শাস্ত্রেও দেখা যায়, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় ইচ্ছা জন্মে না। যাহার ব্রহ্মোপাসনায় ইচ্ছা দেখিবে, তাহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাঁহারা কেবল সংসারের সুখের জন্যই ব্যস্ত, একটু সুখের আশায় মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, জাল জালিয়াত, পরপীড়ন, পরদারগমনাদি করিয়া বেড়ায়, কেবল আমোদ কৌতুককেই পরম আদর করে, তাহাদের ব্রহ্মোপাসনায় ইচ্ছাও হয় না, পরন্তু তাহারা প্রায় ঈশ্বরের নামেরও বিদ্বেষী হয়। যাহারা ঈশ্বরকে চায় না, ঈশ্বরের নাম শুনিলে বিদ্বেষ করে, ঈশ্বরের কথা বলিলে বিদ্রূপ করে, তাহারা কখনই ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নহে। কিন্তু

যাহারা তাহাকেই একমাত্র গতি জানিয়া, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে কেবল তাঁহাকেই ডাকে, তিনি তাহাদের পাপ তাপ দূর করিয়া, পুণ্যবারিতে ধৌত ও পবিত্র করিয়া আপনার সহবাসের অধিকারী করেন। তিনি ভক্তবৎসল ও পতিতপাবন। ব্রহ্মো-পাসক যদি হঠাৎ স্খলিত হয়েন, তাহাতেও তাঁহার বিনাশ হয় না। দেখা যায়, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ব্রহ্মোপাসনা করিয়াও সময়ে সময়ে স্খলিত হইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা হীন হইয়াছেন? ব্রহ্মনামের গুণে পাপী পবিত্র হইবে, অজ্ঞানী জ্ঞানী হইবে। কিন্তু ডাকের মত ডাকা চাই। ব্রহ্ম-নামে দ্বেষ করিলে ব্রহ্মের দয়া বুঝিবে কি প্রকারে? যোগারূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মভাবে যে কথা বলিয়াছিলেন, ঐ সকল কথায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞানেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি ভগ-বানের সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন। আমরা তাঁহাতেও দেখিতেছি,—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

গীতা, ৯ম অ, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ শ্লোক।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

ঐ, ১০ম অ, ৬৬ শ্লোক।

অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্য-পরায়ণ হইয়া আমাকে (সর্ব্বভূতস্থিত পরমাত্মাকে) ভজনা করে, তাহাকেও সাধু মনে করিবে, কেননা তাহার অধ্যবসায় সাধু। সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি লাভ করে, হে অর্জ্জুন, নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্তেরা নষ্ট হয় না। অতিশয় পাপজন্মা ব্যক্তিরাও, এবং স্ত্রী, বৈশ্য, তথা শূদ্রও আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরা গতি প্রাপ্ত হয়, সুকৃতী ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষিদিগের তো কথাই নাই। অতএব এই অনিত্য ও সুখ-রহিত মর্ত্ত্যলোক পাইয়া আমাকেই ভজনা কর। অন্যান্য সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভূতস্থ, জন্মমরণ-রহিত একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করিব, তুমি শোক করিও না।

অনেকের মনে বিশ্বাস আছে, ব্রহ্মোপাসনা গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, এবং সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হইবে। কিন্তু এই ধারণার কোন মূল দেখা যায় না। কেননা ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ট, শৌনক প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সকলেই স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, লইয়া বাস করিতেন। জনক ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও রাজত্ব করিতেন। পরম ব্রহ্মজ্ঞানী মহাদেব সন্ন্যাসী হইয়াও স্ত্রী পুত্র লইয়া ঘর করিতেন। ইঁহারা আহারাদি শারীরিক ব্যাপারও সম্পাদন করিতেন, দেশের রাজনীতিরও আলোচনা করিতেন, যুদ্ধবিগ্রহাদির চিন্তাও করিতেন, আবার সমাজ-চিন্তা এবং গ্রন্থ-প্রণয়নও

করিতেন। কোন কোন ঋষি রাজকন্যারও পাণি-গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, কেহ কেহ অনুরুদ্ধ হইয়া পরস্ত্রীর গর্ভেও সন্তানোৎ-পাদন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও বহুপত্নীও দেখা যায়। সুতরাং ব্রহ্মোপাসকের গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইবে না, এ শাস্ত্র সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

মনু।

গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, এবং যে যে কর্ম্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তথাচ,—

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

মনুস্মৃতি, ১২ শ অ, ৯২ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ যথাবিহিত কর্ম্মসকলও পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান, শম ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতা যে গৃহস্থাঃ ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
স্বস্ববর্গোত্তমাস্তে তু পূজ্যা মান্যা বিশেষতঃ॥

মহানির্ব্বাণ, ৩য় উল্লাস, ১৫০ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা শূদ্র, যে গৃহস্থ ব্রহ্মমন্ত্রে উপাসনা করেন, তিনি স্বস্ব বর্ণের উত্তম হয়েন, এবং বিশেষ পূজনীয় ও মান্য হয়েন।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ॥

বেদান্তসূত্র, ৩য় অ, ৪পা, ৪৮ সূত্র।

সকল কর্ম্মে এবং ব্রহ্ম-সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে।

গৃহস্থ হইলে, তাহার যে ঈশ্বরে প্রযোজন নাই, এমন মনে করা উচিত নহে। বরং গৃহস্থকে যখন সংসার-সমুদ্রে সর্ব্বদাই আন্দোলিত হইতে হয়, সর্ব্বদাই তাঁহার পাপে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাকে ত্রিতাপের ভীষণ অনলে ঝাঁপ দিতে হয়, তখন তাঁহারই সেই ভবকর্ণধার, পতিত-পাবন, ত্রিতাপহরণ, দয়াময় ঈশ্বরের প্রযোজন অধিক। সাধারণ বুদ্ধিতেও ইহাই বলে যে, প্রত্যেকেরই ঈশ্বরে প্রযোজন আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যে কেহ হউক না কেন, সকলেরই ঈশ্বরকে জানা প্রযোজন। বাস্তবিক সেই জগৎ-পিতার নিকট সকলেরই সমান অধিকার।

শাক্তা শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপত্যাস্তথা।
বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥

মহানির্ব্বাণ, ৩য় উল্লাস, ১৪২ শ্লোক।

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, ব্রাহ্মণ, অথবা অন্য জাতি, সকলেরই এই ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে। বাস্তবিক ভববন্ধন হইতে সকলেই মুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু মুক্তি কে দিতে পারে? "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—সাধক কেবল তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করেন, মুক্তির আর অন্য পথ নাই। মন্বাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট বিধান আছে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই সমস্ত যাগযজ্ঞাদির কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। বাহ্যিক অনুষ্ঠান তাঁহাদের না করিলে হানি নাই। যাঁহারা মনে করেন,

আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শরীরকে নিপীড়ন করিলেই ধর্ম্ম হয়, তাঁহারা বড়ই ভুল করেন। আহারাদি ঈশ্বরেরই নিয়ম। তাঁহার নিয়ম পালনে অধর্ম্ম হয় না। তবে যাহারা শরীর-রক্ষণরূপ প্রয়োজন ব্যতীত ক্ষণিক সুখ এবং আমোদের জন্য কোন কর্ম্ম করে, তাহারা তজ্জন্য পাপী হয়। সেইরূপ যাহারা শরীরকে ক্লেশ দেয়, তাহারাও তজ্জন্য পাপী হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

গীতা, ৬অ, ১৬, ১৭ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন, অতিশয় ভোজনকারী,অথবা একান্ত নিরাহারী অতিশয় নিদ্রাশীল, অথবা একান্ত নিদ্রাহীনের যোগ হয় না। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া, উপযুক্ত আহার বিহার, এবং কর্ম্মচেষ্টা করে,এবং উপযুক্তরূপ নিদ্রা ও জাগরণ করে, তাহারই দুঃখহারী যোগ হইয়া থাকে। আরও বলিয়াছেন :—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

গীতা, ২অ, ৫৯ শ্লোক।

জড়, আতুর, উপবাসপরায়ণ বা ক্লিশ্যমান, তপস্যারত মূঢ়দিগেরও ইন্দ্রিয়গণের অসমর্থতা-প্রযুক্ত বিষয় ভোগের ক্ষমতা নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের অভিলাষ নষ্ট হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, পরমাত্মার দর্শন-লাভ করাতে, তাঁহার বিষয়াভিলাষ

পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয়। মূল কথা এই যে, সংযত হইয়া, এবং সুখে দুঃখে অভিভূত না হইয়া, কর্ম্মফল ত্যাগ করতঃ ভগবানের নির্দেশ জানিয়া কর্ম্ম করাতেই তাঁহার সেবা করা হয়। তাঁহাতে একান্ত প্রীতি করাতেই ধর্ম্ম হয়। তিনি ভূতভাবনরূপে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকিয়া বিশ্বের প্রতিপালন করিতেছেন, ইত্যাদি প্রকার ধ্যানই তাঁহার উপাসনা। জ্ঞান ও প্রেম-সহকারে আত্মাতে তাঁহাকে অনুভব করাই যোগ। এ সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

সাকারোপাসনা-প্রতিপাদক ও তাহার সমর্থক বিস্তর যুক্তির মীমাংসা করিয়াছি। আজকাল আবার নূতন একদল লোক দেখা যাইতেছে, যাঁহারা ইহার নূতন ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনকে মুগ্ধ করিতেছেন। আমি আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা বলিতেছি। এই আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে নিন্দার কার্য্য মনে করি না। তবে এই বলিতেছি যে, তাঁহাদের ব্যাখ্যার সকলটুকু সত্য-সম্মত নহে, এবং তাহা গ্রহণ করিলে সাকার উপাসনার কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় নিরাকারই প্রতিপাদন করে। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নিরাকারোপাসক ছিলেন। বহুদিন হইল, তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, সাকার-পূজা কিছুই নহে; কেবল উহার ঐ সকল ভাব গ্রহণ করিলেই উপকার হয়। আমরা জানি, তাঁহার এই ব্যাখ্যা শুনিয়া একজন লোক হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারক সাজিয়া বহির্গত হইয়াছেন। ইনি এক্ষণ এক জন বিখ্যাত প্রচারক।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাব একটী দোষ এই যে, প্রত্যেক দেবতাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদ্বারা ঈশ্বরের প্রকাশ বলিলে, সমস্ত দেবতাকে অস্বীকার করা হয়। প্রধান প্রধান শাস্ত্রকারেরা যাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরেব প্রকাশমাত্র বলা শাস্ত্রসম্মত হয না। আর তাহা বলিলে,প্রত্যেক মনুষ্যের সদসৎ সমুদয কার্য্যকেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদ্বারা ঈশ্বরেব কার্য্য বলিযা প্রতিপন্ন করা যায। সাকারোপাসকেরা কেবল দেবতা নহে, পবন্তু পশু, পক্ষী, বৃক্ষ লতা, নদনদী, দীঘি পুষ্করিণী সকলকেই স্বতন্ত্র দেবতাজ্ঞানে পূজা কবিয়া থাকেন। যে গুলির কেবল মাত্র মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হব, তাহাদেরই না হয আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইল, কিন্তু যে গুলি প্রকৃত জড় পদার্থ তাহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কোথায ?

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আরও ভ্রম আছে। ইঁহারা বলিতেছেন, দুর্গা, কালী প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বরেরই পৃথক্ পৃথক স্বরূপ, পৃথক্ পৃথক্ রূপক ভাবে কল্পিত হইযাছে। কি দেবতা,কি অবতার,সকলকেই ইহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুতরাং কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইল। ইঁহারা দুর্গাকে বলিলেন, "দুর্গা কেহই নহেন, ঈশ্বরই দুর্গতি নাশ করেন বলিযা তাঁহাকে দুর্গা বলা যায়। তাঁহার দশহস্ত অন্য কিছুই নহে, ঈশ্বর দশদিক রক্ষা করিতেছেন,ইহাই বুঝাইবার জন্য ঐরূপ করা হয। লক্ষ্মী সরস্বতীও কিছু নহেন, ঈশ্বরই ধন এবং বিদ্যার প্রদাতা বলিয়া ঐ রূপ কল্পনা হইয়াছে। ফুল দিয়া পূজার অন্য কোন অর্থ নাই, ফুলের আঘ্রাণে মন প্রফুল্ল হয়, প্রাতঃকালে ফুলবাগানে গেলে শরীর ভাল হয়, এই জন্য উহার

আয়োজন"। এইক্ষণ পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনি যখন ধ্যানে বসিলেন, তখন কি ধ্যান করিবেন? দশ-ভুজা মূর্ত্তি, না সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর? নিরাকার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে মূর্ত্তি কোথায় থাকে? আর কাহাকেই বা ফুল জল দিবেন? আপনি যদি ঐরূপ ধ্যান করিতেই পারেন, তবে মূর্ত্তি আপনার কোন্ কাযে লাগিল? বলিবেন, ঐ মূর্ত্তি আপনাকে ঈশ্বরের ভাব স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। যদি তাই হয়, স্মারক চিহ্ন-স্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, আবাহন বিসর্জ্জনাদি কল্পনা করিয়া, ফুল, জল, ও প্রাণিরক্তদ্বারা পূজা করিবার প্রয়োজন কি? আবার স্মারক চিহ্নকে বিসর্জ্জনই বা করেন কেন? অনেকের ঘরে পিতামাতার ছবি থাকে, ঐসকল ছবি দেখিলেই তাঁহাদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহই তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করত অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া আহার করিতে বলেনা, এবং মূর্ত্তির নিকটে গিয়া আমাকে "ইহা দাও, উহা দাও"ও বলে না। আর অত কথারই বা প্রয়োজন কি? প্রত্যেক হিন্দুসন্তানই জানেন যে, দীক্ষিত হওয়ার সময়ে গুরু তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিকেই ধ্যান করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। বাস্তবিক ঐ সকল শাস্ত্রেও ঐরূপ উপদেশ আছে। আর মূর্ত্তির ধ্যান করিলে যে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয় না, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা ঈশ্বর নহে তাহার ধ্যান, যে কথা সাধক নিজে বুঝিতে অক্ষম, সেই কথা বলিয়া তাহার আরাধনা, যাহাদ্বারা মন হইতে রিপু নষ্ট হয় না, এমন ছাগাদি বলিদান, আর, যে প্রার্থনা "ধন দাও, জন দাও" এইরূপ কাকুতি, তাহা

কদাপি ঈশ্বরোপাসনা নহে। তাহার পক্ষে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-রূপ ওকালতী করিলে মিথ্যা জানিয়াও তাহাকে সত্য বলার দোষ হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারক বলেন, ছাগাদি বলি দেওয়াতে মনের রিপু বলি দেওয়া হয়। যাঁহারা ছাগ বলি দিয়া মনে করেন, রিপু বলি দিলাম, তাঁহারা যে কতদূর প্রতারিত হয়েন, তাহার কল প্রত্যক্ষই আছে। ঠাকুরের বেলা হইয়াছে, উপবাসে কষ্ট হইয়াছে, রাত্রিতে মশা এবং শীতে কষ্ট হইয়াছে, বড় গরম বোধ হইয়া উর্দ্ধক বাড়িয়াছে, অধিক আহার করিয়া পেটে অসুখ হইয়াছে, এই প্রকার কল্পনা করা এবং তদনুরূপ কার্য্যকরা বৃহৎ আধ্যাত্মিক ব্যাপার সন্দেহ কি? স্নানযাত্রার সময়ে অধিক জল লাগিয়া জগন্নাথের সর্দ্দি ও জ্বর হইয়া থাকে। পাণ্ডারা তখন তাঁহাকে নানা প্রকার পাঁচন দিতে থাকে। জ্বর ভাল হইলে চিড়েভাজা পথ্য দেওয়া হয়। এ সকল বড়ই আধ্যাত্মিক ভাব বটে। তারকেশ্বরে মহাদেবের পূজায় তাঁহার জটায় আগুন জ্বালাইয়া দিয়া, যখন ফট্ ফট্ শব্দ হইতে থাকে, তখন সকলে জয়ধ্বনি করিয়া বলে, "ঠাকুর গাঁজায় দম দিতেছেন",—ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক ভাবের পরিচয় আর কি হইবে। গ্রামে মড়ক লাগিয়াছে, রক্ষাকালীর পূজা করা চাই, তাহাতে ভাল দুই দল তরজাওয়ালা চাই, তাহারা কখনো এক এক জন এক এক দেবতা হইয়া পরস্পরের দোষ দেখাইতেছে, আবার কখনো অশ্রাব্য ভাষায় পরস্পর গালাগালি করিতেছে,—দেবতা তাহাতে বড়ই খুসী হইতেছেন। ইহা অপেক্ষা গূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাপার আর কি আছে। শক্তি-সাধনার যোগিনীচক্রে অনেক স্ত্রীপুরুষ একত্রে

বলিয়া, মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেছে, শাস্ত্রে আছে চক্রে বসিয়া পরপুরুষ পরস্ত্রী ভেদজ্ঞান করিতে নাই। সুতরাং পরস্পর অভেদভাবে শক্তি-সাধনা হয়। ইহার উপর আর আধ্যাত্মিক সাধন কি আছে। আধ্যাত্মিক শ্রীকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক কুঞ্জবিহার করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণও আধ্যাত্মিক গোসাঞিগণ তাহার আধ্যাত্মিক অনুকরণ করিতেছেন। এ সকল মিথ্যা কথা নহে। এই হতভাগ্য দেশে যে কি পর্য্যন্ত বীভৎস এবং জুগুপ্সিত কার্য্যসকল ধর্ম্মের নামে স্থানে স্থানে চলিতেছে, তাহা যাঁহারা না জানেন, তাঁহারাই সুখী। জানিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। আধ্যাত্মিক ভাব পৃথিবীর সদসৎ সকল কার্য্য হইতেই গ্রহণ করা যায়। এবং সকল কার্য্যেরই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া লোকে যাহা যে ভাবে গ্রহণ করিতেছে, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিক রং ফলাইয়া কি বাস্তবিক দেশের উপকার করা হইতেছে? সাধারণ লোকদিগকে গুরুগণ যাহা বুঝাইয়া দেন, তাহারা তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লয়। জ্ঞানের অভাব-প্রযুক্ত এই সকল কার্য্যকে লোকে ধর্ম্মসাধন বলিয়া মনে করে। আধুনিক ব্যাখ্যাকারকেরা আবার উহারই ওকালতী করিতেছেন। তাঁহাদের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় লোকেরা মনে করিতেছে, তাঁহারা না জানি কতই জ্ঞানী। যার যার মনের মত কথা শুনিলেই লোক খুসী হয়। সুতরাং ইঁহাদের বাহাদুরীরও সীমা নাই। ইঁহারা বুঝাইয়া দিলেন, "আমাদের যাহা আছে, তাহা অতীব উত্তম, গাঢ় আধ্যাত্মিক এবং গভীর বিজ্ঞানসম্মত"। আর চাই কি? বেশ মান সম্ভ্রম এবং

সঙ্গে সঙ্গে অর্থলাভও চলিল। যাহারা কেবল আত্মপ্রশংসা শুনিতে চায়, অথবা অন্যের নিন্দা ভালবাসে, অথবা যাহারা হুজুগপ্রিয়, তাহারাই ইহাতে মুগ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিক ধর্ম্ম-পিপাসু, ভগবৎপ্রেমের যাঁহারা বিন্দুমাত্র আস্বাদন পাইয়াছেন, অথবা যাঁহারা তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই ব্যাখ্যাসকল একান্তই অকিঞ্চিৎকর। ইঁহারা যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব ব্যাখ্যা করেন, সে সকল ভাব অতি উপাদেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কোন তত্ত্বই বুঝিতে পারে না, তাহার নিকট এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অন্ধের নিকট দর্পণের ন্যায়। আর যাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাদের মূর্ত্তিপূজার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপসকল ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহারা মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। আর যাঁহারা তাঁহার স্বরূপের ধ্যান করিতে পারেন না, তাঁহারা মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারিবেন না। লাভের মধ্যে কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া, "অন্ধের স্কন্ধে নীয়মান অন্ধের-ন্যায়" বিপাক-গ্রস্তই হইবেন। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভুলক্রমে মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর জানিয়া সরল বিশ্বাসে পূজা করিতেন। তাঁহাদের সেই সরল বিশ্বাসের জন্য অধোগতি হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণ ইঁহারা মূর্ত্তিকে ঈশ্বরও বলিতে পারিতেছেন না, ঈশ্বরের প্রতিকৃতিও বলিতে পারিতেছেন না, রূপক বলিয়া বলাতে ইঁহাদের এ দুই কুলই নষ্ট হইয়াছে। অথচ লোকের ভয়ে এবং স্বার্থের লোভে ইহা পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না। ঘোর সন্দেহবাত্যাঘাতে

অবিশ্বাস-সাগরে নিমজ্জমান হইয়া, জ্ঞানের হা'ল শ্রদ্ধার পা'ল হারাইয়া, অনন্যোপায় হইয়াই যেন সামান্য তৃণ ধরিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করিতেছেন। পতিতপাবন, দীনবন্ধু,করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপার প্রতি নির্ভর করিতে না পারিয়া যতই আপনাদিগের জ্ঞানবল প্রকাশ করিতে যাইতেছেন, ততই নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতেছেন। সরল সাকারবাদীগণ ইঁহাদিগকে সাকার উপাসনার রক্ষক বলিয়া সমাদরে ইঁহাদের কথা শুনিতেছেন; কিন্তু হায়, তাহাদের সেই চির-সঞ্চিত সরল বিশ্বাস উড়াইয়া দিয়া ইঁহারা বলিতেছেন, "মূর্ত্তির উপাসনা করিনা, উহা ঈশ্বর নহে, ঈশ্বরের স্বরূপের রূপক মাত্র। সেই রূপক ভাব গ্রহণ করিবার জন্যই উহার সৃষ্টি। রাধাকৃষ্ণের জন্মাদি মিথ্যা। উহা কেবল ভক্ত ও ঈশ্বরের প্রেমভাবের রূপক বর্ণনা মাত্র।" সরল বিশ্বাসীগণ মহা হুতাশে পড়িতেছেন। অপর দিকে যাহারা ভিতরে ভিতরে সাকার উপাসনার প্রতি সরল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছিলনা, অথচ সমাজের ভয়ে এবং স্বার্থের মায়ায় তাহা পরিত্যাগও করিতে পারিতেছে না, দশ রকম ভোগসুখ এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় পড়িয়া ঈশ্বর চিন্তার প্রতিও পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকে আরও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহারা পুতুলের ভয় অনেকদিন ছাড়িয়াছে, ঈশ্বরের নামে যে একটু ভয় ছিল, তাহাও নষ্ট হইল। অরাজক রাজ্যে যেমন যাহার একটু বল থাকে, সেই লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, সেইরূপ এই ব্রহ্মচিন্তাবিহীন দেশে যার একটু তর্কবল আছে, সেই দস্যুর মত নানা কথায় ভুলাইয়া ভিতরে ভিতরে লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারকেরা যে যে যুক্তি প্রদান করেন, এই পুস্তকের যুক্তিগুলির সঙ্গে মিলাইয়া লইলেই পাঠক সহজে তাহাদের অসারতা বুঝিতে পারিবেন। কেবল পুনরুক্তিদ্বারা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এই প্রবন্ধটী লিখিতে লিখিতে আর একটী কথা মনে পড়িল। প্রচার নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড, ২য়, ৩য়, ৪র্থাদি সংখ্যায় 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্তবাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাকার উপাসনার পক্ষে একটী যুক্তি দিয়াছেন। তাহা এই যে, "ইষ্টদেবের চিত্তের উন্নতভাব অনুকরণের চেষ্টাই উপাসনা। যে ভাব সুন্দর (যাহা সুন্দর তাহাই উন্নত) সেই ভাব অন্তরে ক্রমাগত উদিত করিবার চেষ্টাদ্বারা অর্থাৎ অবিরাম অভ্যাসদ্বারা মানব নিজে সেই সুন্দর ভাববিশিষ্ট হয়।" পুনশ্চ, "যাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয় ভোঁতা, যাঁহারা রূপমাহাত্ম্য বুঝেন না, তাঁহারা রূপচিন্তাদ্বারা ইষ্টদেবের উপাসনা করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদের নিরাকার উপাসনা ব্যতীত আর গতি নাই।" রূপ কি? না, "সমস্ত দেহ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হইতে যে এক ছটা নির্গত হয়, যে ছটা দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তরিন্দ্রিয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কোন বাক্যাদির সাহায্য ব্যতিরেকে, অন্তরে নানারূপ ভাবের উদ্রেক করে, তাহাই যথার্থ মানবের রূপ বা রূপের সারভাগ।" এক্ষণে কথা এই, ঈশ্বরের তো "দেহ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল" নাই, তাঁহার উক্তপ্রকার রূপ কোথায় পাই? তার উত্তরে বলিবেন "কেন? ঈশ্বরোপাসনার জন্য মনে মনে যে আদর্শ গড়িয়াছি, তাহাতে ইচ্ছামত রূপ দিলাম।" যাঁহারা

ঈশ্বরকে বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা নিজের মনোমত আদর্শ গড়িয়া, তাহাতে নিজের মনোমত রূপ দিয়া, আবার তাহারই চিন্তা করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিলে মনে যথেষ্ট উন্নতভাব আসিবে বটে। আর কৃষ্ণধন বাবুর কথায় ইহাও প্রতিপন্ন হই-তেছে যে, এই রূপ-জ্ঞানের কর্ত্তা অন্তরিন্দ্রিয়, চক্ষু উপায় মাত্র। ভাল, এতই যদি দর্শনেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, তবে সেই অরূপ রূপ যাহার সৌন্দর্য্যে সমস্ত জগৎ বিমুগ্ধ, তাহা দেখিতে পাওনা কেন? ঈশ্বর যে "দগ্ধেন্ধনমিবানলম্"—দগ্ধদারু-নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় পরমাণু ভেদ করিয়া আপন চিন্ময়,উজ্জ্বল,জড়ীয় সৌন্দর্য্যের অতীত, অনির্ব্বচনীয় ভুবনমোহন রূপে মুদিত-নেত্র ধ্যানপরা-য়ণ ভক্তের অন্তর বাহিরের অন্ধকার নষ্ট করিয়া তাঁহার প্রাণকে মোহিত করেন, তাহা দেখিতে পাওনা কেন? অহো, যাঁহারা বিশ্বের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় সুতীক্ষ্ণ, সুসূক্ষ্ম, সর্ব্ব-ভেদী দৃষ্টিতে বিশ্বকর্ত্তার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ ও একেবারে বিহ্বল হইয়া যান, তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয় ভোঁতা, না যাঁহারা নিজের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, মলিনতাময়, কল্পনা-প্রসূত জড়ীয় রূপের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই দর্শনেন্দ্রিয় ভোঁতা? যদি চক্ষুই থাকিত, অথবা জ্ঞানাঞ্জনে চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া ভক্তিব্যাকুল নয়নে বিশ্বের দিকে চাহিতে জানিতে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র কল্পনার দাস হইতে হইত না। তুমি ঈশ্বরের রূপ ধরিতে পার না, ঈশ্বরকে আশ্রয় করিতে পার না, তাই কল্পনার আশ্রয় লইয়াছ? কল্পিত মূর্ত্তি তোমাকে রক্ষা করিবে? মনের চঞ্চলতার সঙ্গে যাহার ক্ষণে ক্ষণে নাশ হইবে, তাহা তোমাকে রক্ষা করিবে? হায়! আত্মপ্রতারণা ইহাকেই বলে! অন্ধ মনে

মনে যেমন অদৃষ্ট ব্যক্তির রূপ কল্পনা করে ইঁহাদেরও সেই দশা।

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা।।

যদি মনঃকল্পিত মূর্ত্তি মানুষকে মোক্ষ দিতে পারে, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও মানুষ রাজা হইতে পারে।

কৃষ্ণধন বাবুর বড় ভয়, পাছে ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলে তিনি সগুণ হইয়া যান। অত ভয় কেন? ঈশ্বরকে নিজে যেরূপে ধরিতে পার, তাই ধর। তিনি তোমার নিকট যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন,তাই ধর। তাঁর প্রকাশ ধরিলে তাঁহাকেই ধরা হইবে। শিশু পিতার যাহাই বুঝুক, পিতার মাহাত্ম্য বুঝিতে যতই অক্ষম হউক, পিতাকেই পিতা বলিয়া ডাকে, অন্য পিতা গড়ে না। যদি একেবারেই অন্ধ হইয়াথাক, তাঁহার প্রকাশ একেবারেই দেখিতে না পাও, কোনরূপেই,ঈশ্বর আছেন ইহা জ্ঞান-গোচর না হইয়া থাকে, যাহা ইচ্ছা কল্পনা কর, ক্ষতি নাই। কিন্তু বিনীত হও, শমগুণ অবলম্বন কর, ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যগণের নিকট গমন কর, শিক্ষা কর।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

গীতা, ৪ অ, ৩৪ শ্লোক।

আচার্য্যসমীপে গমন করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা সেই জ্ঞান উপার্জ্জন কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। প্রবন্ধকলেবর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি ভগবান্ আশা পূর্ণ করেন,

এবং পাঠকবর্গের আগ্রহ হয, শাস্ত্রসকল মন্থন করিয়া ব্রহ্মসাধন-তত্ত্ব যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ আর একটী কথা বলিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিব। শাস্ত্রে আছে—

উত্তমা সহজাবস্থা, মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতি স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥

অর্থাৎ স্বভাবত জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে নিত্যযুক্ত থাকাই উত্তম। ধ্যানধারণাদ্বারা ঐ যোগ উপলব্ধি করিতে পারা মধ্যম। জপস্তুতি প্রভৃতি অধম, এবং হোম পূজা অধমাধম।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্।
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥

গীতা, ১৮শ অধ্যায, ২০, ২১, ২২ শ্লোক।

যে জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বভূতে অভিন্নরূপে অবস্থিত এক নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বভূতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন আত্মাকে দৃষ্টি করে, তাহা রাজসিক জ্ঞান। আর কেবল প্রতিমাদিতে পূর্ণরূপে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন, এইরূপ অযৌক্তিক, পরমার্থাবলম্বনশূন্য, অতএব তুচ্ছ জ্ঞান তামসিক।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্‌যোমাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ।

ভাগবত, ৩য় স্ক, ২৯শ অ, ৮ শ্লোক।

বিষয়, যশ বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করতঃ যে ব্যক্তি ভেদদর্শী হইয়া আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করে, সে রাজসিক হয়।

এই সকল চিন্তা করিয়া, সাকারোপাসনার হীনতা হৃদয়ঙ্গম করতঃ শ্রেষ্ঠ পথ অন্বেষণ করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ॥

উত্তম মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়।

অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥
ঈশোপনিষদ্, ৩ শ্লোক।

আত্মঘাতীরা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবিহীন লোকেরা মরণান্তে সেই অসুর-লোক প্রাপ্ত হয়, যাহা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

এক্ষণে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা একবার এই বিষয়টী উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখুন। আত্মার জন্যই সকল ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে সেই আত্মার উপকার না হইল, তাহা লইয়া অন্ধের মত টানাটানি করায় উপকার কি? হিন্দুশাস্ত্রে যে সাকারোপাসনার বিধি আছে, তাহা যেরূপ মূর্খদের জন্য, আজকাল ভদ্রসমাজে সেরূপ মূর্খ অতি অল্পই আছেন। তবে সাধ করিয়া মূর্খ সাজিলে তাহাতে নিজেরই ক্ষতি। যিনি যাহা করিতে পারেন, বা করিতেছেন, তাহা নিজে অবশ্যই অবগত আছেন। সুতরাং কেবল কূট তর্ক করিয়া কোলাহল করা অপেক্ষা আপনাপন সাধনের সমালোচনা করাতে অধিক উপকার হয়। যাঁহারা

বিশ্বাস টলিয়া যাইবে বলিয়া সমালোচনা করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা জ্ঞানের দ্বার দৃঢ়রুদ্ধ করিয়া আপনারাই প্রতারিত হইতেছেন। আর যাঁহারা স্বয়ং অবিশ্বাসী অথবা সাধনহীন হইয়াও কেবল ওকালতীদ্বারা নিজের কথা সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহারা নিজেরই সর্ব্বনাশ করেন। ঈশ্বর যাঁহার লক্ষ্য, তিনি কুটীল যুক্তি ভালবাসেন না। তিনি চিরকালই সরল, এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শুনিতেও তাঁহার গভীর উৎসাহ। আর ভোগসুখ, আত্ম-প্রাধান্য এবং পরনিন্দাই যাহার লক্ষ্য, সে ঈশ্বরের নাম শুনিলেই ক্ষেপিয়া উঠে, এবং ঈশ্বরের উপাসককে বিদ্রূপ করে। মনুষ্যকুলে তাহারা অসুর। এই অসুর-শ্রেণী হইতে পরমেশ্বর আমাদের দেশকে রক্ষা করুন। সকলেই বিনয় এবং ব্যাকুলতার সঙ্গে সত্য অন্বেষণ করুক। সত্যেরই জয় হউক।

হায়, হিন্দুধর্ম্মের কি দুর্দশা! ভারতের কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। এই স্থানে একদিন কত শত ব্যাস, বশিষ্ট, যাজ্ঞবল্ক্য অবিরত ব্রহ্মগাঁথা গান করিতেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ ব্রহ্মনামে বিদ্বেষ করিতেছে। এই ভারতে ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বলিতেন, "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" ; আর আজ সেই ভারতবাসী ছার ইন্দ্রিয়সুখে মুগ্ধ হইয়া, ছার সুখের আশায় ক্ষুদ্র দেব দেবী এমন কি ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, শঙ্খিনীকে পূজা করিতেছে, আর ব্রহ্মপূজার কথা শুনিলেই "ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল' বলিয়া কোলাহল করিতেছে। এই ভারতে ব্রহ্মদর্শন অবশেষে আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-সাধন করিয়াছিল, আর আজ সেই ভারতবাসী ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব

বলিয়া বক্তৃতা করিতেছে। একদিন যে ভারতের স্ত্রীলোকের মুখ হইতে বেদ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই ভারতের বিদ্বান্ পণ্ডিতগণও এক্ষণ ক্ষুদ্র দেব দেবীর পূজা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন। ভারতের তীর্থসকল এক্ষণ আর ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করে না, কেবল অজ্ঞানান্ধকারে পথভ্রষ্ট কুসংস্কারাপন্ন নরনারীর সে সকল স্থানে আসা যাওয়াই সার হইতেছে। পরন্তু ঐ সকল পবিত্র স্থান এক্ষণ দুরাত্মাগণের সর্ব্বপ্রকার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিরাপদ আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া, সাধু ভদ্রলোকের অগম্য হইয়া উঠিতেছে। যে দিন ভারত সেই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেইদিন হইতে যে গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক গ্রাস করিয়াছে, কে জানে আবার কতদিনে সে অন্ধকার তিরোহিত হইবে।

আর্য্যসন্তানগণ! পৃথিবীর সকল শাস্ত্রই ঈশ্বরকে একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। যাহারা অতিশয় অজ্ঞ, সম্পূর্ণ ঈশ্বর জ্ঞানবিহীন, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং কেবল আহারবিহারকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে, তাহাদের উপযোগী বিধানকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না। যিনি, সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব, উত্তম ইন্দ্রিয়বৃত্তি, চিন্তাক্ষম মন, সদসৎবুদ্ধি, নিত্যানিত্য বিবেক, এবং আপনার প্রতিকৃতিস্বরূপ আত্মা দিয়া ভূষিত, ও সকল প্রাণীর একমাত্র অধিপতি করিয়া আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, যদি এ সমুদয় দ্বারা তাঁহারই সেবা না করিলাম, তবে ইতর জন্তু এবং উদ্ভিজ্জাদির সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কোথায়? যিনি, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদ্বারা সর্ব্বদাই আমা-

দিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই পরম সুহৃদকে কোন্ প্রাণে ভুলিব ? যিনি, ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় বারি, রোগে ঔষধ, শোকে শান্ত্বনা, বিপদে বন্ধু, সম্পদে সহায়, নিরাশায় আশা, সাধনে সিদ্ধি বিধান করিতেছেন, একবার কি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেও ইচ্ছা হয় না? যিনি আমাদের আরামের জন্য চন্দ্রে স্নেহ, কুসুমে সুবাস, ফলে সুরস, জলে শীতলতা, পক্ষীতে সুস্বর এবং প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য দিয়াছেন, আমাদিগকে সেবা করিতে, যাঁহারই আদেশে সূর্য্য উদিত হইতেছে চন্দ্র সুশীতল কিরণ দিতেছে, নক্ষত্রগণ ধাবিত হইতেছে, পৃথিবী সঞ্চালিত হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ বর্ষণ করিতেছে, বসুন্ধরা শস্য প্রসব করিতেছে, দিবারাত্রি পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; শিশিরবসন্তাদি ঋতুগণ সঞ্চরণ করিতেছে ; আমরা কি একবার তাঁহার অনুসন্ধানও করিব না? জাগরণে তিনিই সঙ্গী, নিদ্রায় তিনিই প্রহরী। সম্পূর্ণ অসহায় মানবের কি জননী জঠরে, কি পৌগণ্ডে, কি শৈশবে কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, কি বার্দ্ধক্যে, কি জরায়, কি মৃত্যুতে, তিনিই সহায়, আমরা কোন্ প্রাণে তাঁহাকে ভুলিব? ধর্ম্মপথে তিনিই জ্ঞান-দাতা গুরু, পাপসাগরে, তিনিই পতিতপাবন কাণ্ডারী। আমরা যতই তাঁহাকে পরিত্যাগ করি, তিনি কিছুতেই আমাদিগকে ছাড়েন না। আপন কর্ম্মফলে আমরা দুঃখে ও পাপে পড়ি, তিনি পুনরায় অদৃশ্য থাকিয়া আমাদিগকে ধরিয়া তোলেন। এমন ইহকাল পরকালের একমাত্র বন্ধুকে কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ করিব? জাগ্রত হও, সেই পরমাশ্রয়ের শরণাপন্ন হও ; তাঁহাতে প্রীতি কর। তাঁহাতে প্রীতি করিলে